গল্প বলছি ইন্দিরাদি

ইন্দিরা দেবী



গল্প বলছি ইন্দিরাদি

ইন্দিরা দেবী

দে'জ পাবলিশিং। কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখ, ১৩৯৫
এপ্রিল, ১৯৮৮

প্রকাশক :
সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

ভেতরের চিত্রাঙ্কন :
সিদ্ধার্থ মৈত্র

প্রচ্ছদ :
ধীরেন শাসমল

মুদ্রাকর :
নিত্যানন্দ পাঁজা
মা কালী প্রেস
৪/১ই, বিডন রো
কলিকাতা-৭০০০০৬

দাম : ১০ টাকা
(Rupees Ten only)

রোশনি—কে

কোলকাতা
১লা বৈশাখ,
১৩৭৫

ছোটদের কাছে ছোট কৈফিয়ৎ !

ছোট বন্ধুরা আমার !

গল্পগুলি শুধুই গল্প নয়। তোমাদের অনেকের ভালো লেগেছে বলে আরো অনেকের জন্য প্রকাশ করলেন দে'জ পাবলিশিং। তোমরা প্রয়োজনবোধে চিঠিও লিখতে পারো প্রকাশকের ঠিকানায়। ভালোমন্দ সব কিছু বললে খুশী হবো। আরো খুশী হবো তোমাদের ভালো লাগলে ॥

ইন্দিরাদি

আমাদের প্রকাশিত লেখিকার অন্যান্য বই :

বুনুর অসুখ

পুতুল পুতুল

রাজার মুকুট

সূচীপত্র

মন্দ হলেও মন্দ নয়

আজ সন্ধ্যেবেলা মা বাড়ী নেই। মা বলে গেছেন কলিংবেল টিপলেই দরজা খুলবে না। আগে জানলা দিয়ে দেখবে কে, যদি চেনা কেউ হন তাহলে বসাবে না হলে বলবে কেউ বাড়ী নেই। আমার, তোমার বাবার আসতে দেরী হবে একটু—খুব সাবধান। না কি, আমি তালা দিয়ে যাবো? তালা দিয়ে যেতে ভয় করে, ঐ যে সেবার ধর বাড়ীতে আগুন ধরে গিয়েছিল—আর এখন তো তোমরা বড় হচ্ছো। সাবধানে থাকতেই হবে। আমাকেও তো বেড়োতে হবে মাঝে মাঝে। কেমন পারবে তো? টুকটুকির আত্মসম্মানে আঘাত লাগলো—বলো কি মা থাকতে পারবো না? তাছাড়া বাচ্চু তো আছে। আমি বুঝি বড় হইনি? অচেনা কাউকে দরজা খুলবো না। সে তো আমি বরাবর শুনে আসছি। খুলিও না, তবে অত ভাবছ কেন? তাছাড়া যতখানি পড়া লেখা আছে আজ শেষ করে উঠতে পারলে হয়, করতেই হবে নইলে কাল ক্লাসে গিয়ে শুনবো—কোন্ সিনেমায় কোন্ ছবি ছিল? বাব্বাঃ একঘর মেয়েদের সামনে নীলিমাদি কি করে যে বলেন; যাক গে মা তুমি ভেবো না। ঠিক থাকতে পারবো। কিন্তু সত্যি করে বল না মা, দিহুকে দেখতে যাচ্ছ না সিনেমায়? আচ্ছা তুমি সব স্টারদের চেনো? কাকে তোমার ভালো লাগে? একনিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেলে টুকটুকি মার দিকে তাকালো। মা হেসে ফেলে বললেন—তা কি করে চিনবো বল তোমাদের মত তো সব সময় ঐ কথা নিয়ে থাকি না। চিনি

আর না চিনি যা বলছি মন দিয়ে শোনো, কাউকে দরজা খুলে দেবে না, কেমন ?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, এই বাচ্চু শুনছিস ? একেবারে দরজা খোলা নয়, বুঝেছিস ? বাচ্চু খুব ব্যস্ত ছিল তার খেলার সরঞ্জাম নিয়ে—অন্যমনস্কভাবে বললো : এই তো একটুখানি খেলার সময়। চুপ করতো, আমি দরজা খোলা-বন্ধর ব্যাপারে নেই। মা বললেন—বাঁচা গেল। তাহলে টুকটুকি মনে রেখো—হ্যাঁ রাখবো। টুকটুকি ভাবলো আজ যদি ওর দু'বন্ধুকে আসতে বলতো, জোর খেলাটা জমতো আর আমি কি কি কাজ শিখেছি—ওদের দেখিয়ে দিতাম—কিন্তু কি আর হবে এখন উপায় নেই।

যথা সময়ে মা চলে গেলেন। ভালো করে ভিতর থেকে বন্ধ করে টুকটুকি বেশ গম্ভীর সুরে বলল—বাচ্চু একদম এদিক ওদিক নয়, মন দিয়ে পড়া তৈরী করে ফেলো। তারপর নিজের চেয়ারটা টেনে নিয়ে জানলার দিকে সরে গিয়ে বই খুলে বসলো। মনে মনে ভাবলো আগে যদি জানা যেতো···যাক, কি আর হবে ? আচ্ছা মা কি সত্যি—দিদুকে দেখতে গেল ? কোথাও বেড়াতে—শান্তামাসির বাড়ী কিম্বা সুনন্দামাসির বাড়ী ? তা গেলেই বা, একেবারে বেড়োতে পারেন না, একটু খেলতে ইচ্ছা করে। আর কি হবে ?

—এই শোনো খুকি ? জানলার কাছে একটা মানুষ দাঁড়িয়ে ডাকছে।

—না আমি তো খুকি নয় টুকটুকি। আর কি শুনবো, দরজা খুলতে বারণ আছে। লোকটা হেসে বললে—না দরজা খুলতে হবে না আমি দেখছিলাম তুমি সন্ধ্যে হতে না হতেই পড়তে আরম্ভ করেছ, তাই—।

—তাই আবার কি ? মা এসে বকবে না ? দুড়ুম দাড়াম হতে পারে, তাই ইচ্ছা না করলেও পড়তে হবে যে।

—বারে তুমি কি লক্ষ্মী মেয়ে। আমি এমন মেয়ে দেখিনি। তা



জানলার কাছে একটা মানুষ দাঁড়িয়ে ডাকছে

স্কুলে কি কি বই পড়ো ?

—অনেক, অনেক। তুমি ভাবতেও পারবে না। টিফিনের আগে পর্যন্ত নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ নেই। তারপর একটু হালকা হয়। তুমি কি স্কুলে যাও না ? লেখাপড়া করো না ? বাবার মত অফিসে যাও !

—হ্যাঁ, না, এই এদিক-ওদিক আচ্ছা, ঐ বইগুলো সব তোমার ?

—হ্যাঁ সব আমার, মা বলেন কি জানো, বই-এর ভারে মেয়ে আমার নড়তে পারে না। এত বই কি সব পড়ে মুখস্থ করা যায় ?

— সব মুখস্থ করবে কেন ? মনে রাখবে ভালো করে পড়ে।

—তুমি কি স্কুলে পড়নি ? জানো না ? ভালো করে বলতে না পারলে এক ক্লাস ভর্তি মেয়েদের সামনে—

—যাক গে কি বলছিলে বল ? মা-বাবা নেই আর দরজা খুলতে বারণ— কি করবো বল ?

—না তোমার দরজা খুলতে হবে না। আচ্ছা পড়ার মধ্যে কি পড়তে ভালো লাগে, আর খেলার মধ্যে ?

টুকটুকি বললে—এত কথা তো জানলা থেকে বলা যাবে না দরজা খুলতেও পারবো না, তুমি বরং আর একদিন এসো। মা থাকলে তোমায় জলমিষ্টিও দেবে।

লোকটা একটু হেসে বললে—আমি জলমিষ্টি চাইছি না, তুমি যে কি ভালো মেয়ে তাই ভাবছি, দেখছি। আচ্ছা তোমার সিনেমা দেখতে যেতে ইচ্ছা করে না ?

—ও কথা আর বলো না—ইচ্ছে করে বৈকি—কিন্তু দিচ্ছে কে ? স্কুলের থেকে বছরে একটি বার। বড় জোর গল্প করে সব স্টারদের নাম—কাগজে রাস্তার প্ল্যাকার্ডে ছবিও দেখি। কিন্তু যাওয়া হয় না। তুমি কি অনেক ছবি দেখো। ঐ সব লোকদের চেনো ?

—না খুব দেখি না। কিন্তু টুকটুকি তুমি বেশ মেয়ে। তোমার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভালো লাগলো। তবে মাকে বলো—একা রেখে যেতে নেই।

চোখ দু'টো বড় করে টুকটুকি বললে: একা কি গো, বাচ্চু আছে না? বাচ্চু—ও বাচ্চু! তাছাড়া আমি বড় হয়েছি না? ক্লাস ফাইভে পড়ি না? দেখেছো আমার টেবিলে কত বই?

—হ্যাঁ দেখছি তো আর দেখছি তুমি কত ভালো মেয়ে! আচ্ছা পড়ো, আমি তাহলে যাই?

—যাবে? কিন্তু মা বলে যেই আসুন—জল বা চা দিতে হয়—দাঁড়াও। চা তো করতে পারবো না; জল খাবে।

জল এনে জানলা দিয়ে দিতে গিয়ে দেখা গেল গেলাস ভালো ভাবে যাচ্ছে না। জল পড়ে যাচ্ছে। মুখ শুকিয়ে টুকটুকি বললে: কি হবে বলতো? জলটা খাবে কি করে? তুমি বরং মিষ্টিটা খেয়ে নাও। লোকটি বললে: না, না, মিষ্টি জল কিছুই লাগবে না, আমি এখন যাই টুকটুকি—তুমি খুব ভালো মেয়ে।

—না, না তুমি যেয়ো না, আচ্ছা দাঁড়াও দরজা খুলছি তুমি জলটা খেয়ে নিলেই বন্ধ করে দেবো। আর শোনো, মা যখন থাকবে তুমি এসো। আচ্ছা তুমি কি কিছু বিক্রি করতে এসেছো? অমনি। তাহলে ঠিক আছে। দেখো না, সব Announce করে বাড়ীতে সেলসম্যান এলে দরজা খুলবে না।

এবার লোকটি খুব জোরে হেসে উঠলো: না গো টুকটুকি। আমি চোরও হতে পারি।

টুকটুকি চোখ দু'টো একেবারে বিস্ফারিত করে বললে: সে কি করে হবে? তুমি কত সুন্দর কথা বলছো জামা-কাপড় কত পরিষ্কার, লেখাপড়ার খবর চাইছো—তুমি কি করে চোর হবে?

—আচ্ছা আচ্ছা, চোর নাই হলাম। তোমাকে খুব ভালো

করে লেখাপড়া করতে হবে। সেরা মেয়ে হবে—কেমন? আমি যাই।

—সে আবার কি বলছো, মা যে বকবে। কি বলবে জানো, কিছু শেখোনি। লোক এলে বসাতে হয় তারপর কোথা থেকে এসেছেন কাকে দরকার তা জানতে হয়। তারপর তাকে ডেকে দিতে হয়। হয় চা দিতে হয়, না হলে ঐ যে দেখছো বোতলে সরবৎ করা আছে তাই দিতে হয়—আমি তো কিছু করিনি। জলটাও দিতে পাচ্ছি না—কিন্তু তুমি কার কাছে এসেছিলে?

—তোমার কাছে, ভাবছিলাম পড়াটা একটু দেখিয়ে দেবো।

—কিন্তু তুমি আমায় খুব ভাবনায় ফেললে, জলটা দেবো কেমন করে? আচ্ছা আমি দরজা খুলি, জলটা নাও—কেমন?

—আচ্ছা দাও।

দরজা খুলতেই লোকটা একেবারে টুকটুকির পড়ার টেবিলে এসে বসে বললে: "এত বই পড়তে হয়?

—হ্যাঁ গো, কত তো বই, সব পড়া হয় না। এই নাও জল।

—আচ্ছা কোন্‌টা শক্ত লাগে তোমার? আমি দেখিয়ে দিই—বলে টুকটুকির খাতা পেনসিল নিয়ে বললে, বলো।

এবার টুকটুকি থতমত খেয়ে বলছে কি আর বলবো মাষ্টারমশাই না এলে আমার কথা বলতেই পারবো না। তুমি জল খাও।

—জল পরে খাবো। দেখ, সন্ধ্যেবেলা একা থেকো না তোমরা এমন করে। কত দুষ্টু লোক আসতে পারে। জিনিসপত্র নিয়ে যেতে পারে। তাই না?

—ঠিক বলেছো। তুমি বসো আমি দরজাটা বন্ধ করে আসছি।

এবার লোকটা হেসে ফেলে বললে: তুমি তো বেশ মেয়ে, আমি যে রয়ে গেলাম।

টুকটুকি বলল: তুমি তো বই দেখছো।

—না আর দেখবো না। কই জল দাও! ঢক ঢক করে জলটা

খেয়ে লোকটি বললে : তোমার সঙ্গে আলাপ করে খুব ভালো লাগলো টুকটুকি, যা ভেবে এসেছিলাম তা করা গেল না। জল খেলাম। কিন্তু শোনো মা যা বলেন তা ভাল করে মনে রাখতে হয়। দরজা খুলে দিতে নেই, কত লোক আসতে পারে। জিনিষপত্র তুলে নিয়ে যেতে পারে—তুমি তো ছোট কিছু করতে পারবে না।

—না, তোমার মত ভাল লোক হলে কিছু নেবে না।

—আমার মত ভালো লোক? হেসে উঠলো লোকটি। বললে : দরজা বন্ধ করো টুকটুকি আর অচেনা মানুষকে দরজা খুলতে নেই। ভালো করে পড়াশুনা করে বেশ নামকরা মেয়ে হতে হবে কেমন?

—হ্যাঁ, তুমি চলে যাচ্ছ? আবার এসো, এখন আর কথা বলবো না, একেবারে পড়া হয়নি কিনা।

লোকটি টুকটুকির দিকে তাকাতে তাকাতে পথের লোকেদের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

একটু পরেই পাড়ার নাড়ুদা ও পটলদা টুকটুকি এই টুকটুকি! কে এসেছিল রে?

মুখ বাড়িয়ে টুকটুকি বললে : ওতো নাম বলেনি। গল্প করে বলে গেল ভাল করে পড়াশুনা করতে।

—দরজা খোল দেখি কিছু করে গেল কিনা। দরজা খুলে টুকটুকি বললে : ও তো আমার টেবিলে বসে বই দেখছিল। গল্প করে চলে গেল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওকে আমি জল মিষ্টি দিয়েছি। না হলে মা আমাকে শুধু বকতো না মারতোও।

নাড়ুদা পটলদা দু'জনেই মুখ চাওয়াচায়ি করে বললে : গাধা মেয়ে কোথাকার! কাকে দরজা খুলে দেয় ঠিক নেই। ও কে জানিস।

—ও বেশ ভাল লোক নাম তো জিজ্ঞাসা করিনি। কে?

—খুব বেঁচে গেছিস, কাকা-কাকিমা বাড়ী ফিরুক কি কাণ্ড হতে

যাচ্ছিল—ওটা একটা বিখ্যাত চোর—ওর নাম সুরেন। পুলিশ দেখলেই ওকে ধরবে। আমরাও!

ঘাড় নেড়ে টুকটুকি বললে: কখনও না, ও আমায় ভালো করে লেখাপড়া করতে বলে গেছে। আবার আসবে বলেছে। না, না মোটেই চোর নয়।

নাড়ুদা পটলদা বাবা-মার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। এদিকে পাড়ায় হৈ-চৈ পড়ে গেছে তখন।

মামার গল্প

গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। নকুড়মামা অনেক গল্প বলেন। সত্যি-মিথ্যে যাচাই করার সময় হয়নি। কিন্তু আমার এই মামার গল্প আমি ছোটদের একাধিকবার শুনিয়েছি। আরো শোনাবার ইচ্ছা আছে।

নকুড়মামা লম্বায় ছয় ফুট। প্রশস্ত বুকের ছাতি, সুগৌর গায়ের রং। সদম্ভে কথা বলেন, উচ্চ হাসিতে ঘর ভরিয়ে তোলেন। আর সবচেয়ে তাঁর মজার মজার গল্প ছোটদের কাছে আকর্ষণীয় তো বটেই। বড়রাও বলেন 'জমাটি বটে নকুড়'! নকুড়মামার ডাকনাম এটা, আর কেবল মা ডাকেন। অমন সুন্দর মামার কেন এমন নাম—তার ইতিহাস আছে। তবে ভাল নাম তো একটা আছেই 'সুদর্শন চক্রবর্তী'।

মামার চাকরিটা বেশ বড় ধরনের আর প্রায়ই এদেশ-ওদেশ ঘুরতে হয়। মাঝে মাঝে আমাদের মানে ভাগ্নে-ভাগ্নীদের সত্য-মিথ্যা জড়িয়ে যেসব চিঠি লেখেন তা এক-একটা মস্ত গল্প হয়ে আসে—শেষে অবশ্য ফুটনোটে লেখা, যাকে 'বিশ্বাস করো আর নাই করো'। কিন্তু নকুড়-মামার কথা আমরা প্রত্যেক ভাই-বোন শুধু নয়, যারা শোনে তারা বিশ্বাস করে আর হেসে লুটোপুটি খায় আর বলার ভঙ্গী দেখে আরো বিশ্বাস করে—মাঝে মাঝে বলে ওঠে 'এসব সত্যি ?'

নকুড়মামা জোর গলায় বলে ওঠেন : সত্যি মানে ? স্বচক্ষে দেখা। সময় তারিখ হিসাব করলে হয়তো নকুড়মামা তখন জন্মেছেন কিনা সন্দেহ।

অবশ্য তাকে দেখলে বা কথা শুনলে এমনই আকর্ষিত হয়ে যায় মন যে, সন-তারিখ মেলাবার আর ইচ্ছাও জাগে না।

ছোটদের কাছে তিনি বেশী ভূতের গল্প বলেন। শেষ হলে যখন বলেন, যাও তোমাদের পড়ার বা খাবার সময় হয়ে গেছে। একটু গলার আওয়াজ নীচু করে বলেন, এতক্ষণ এতকথা বললাম কিন্তু ভূত বলে কিস্‌সু নেই।

কেউ কেউ বলে ওঠে—তবে যে নকুড়মামা তুমি এতক্ষণ···। মামা তখন জোর দিয়ে বলে ওঠেন, ঘড়িটা দেখেছ কি, কখন খাবার সময় হয়ে গেছে? আবার কাল।

কাল? ছোটদের মন নিরুত্তাপ হয়ে যায়, কাল হয়তো নকুড়মামা চলেই যাবেন। আসেন ঘন ঘন কিন্তু থাকেন একবেলা যা কয়েক ঘন্টা। তার মধ্যেই তিনি মাতিয়ে রাখেন বড় ছোট সবাইকে—এমনকি গম্ভীর মুখ বাবাকেও হাসিয়ে ছাড়েন।

মা'র খুব গর্ব ও আনন্দ এই ভাইকে নিয়ে। মামারবাড়ির বিশেষ কেউ নেই বলে নকুড়মামা দিদিকে আর দিদিভাইকে আশ্রয় করে দীর্ঘদিন চলে আসছেন।

এত ভাব-ভালবাসা ভাইবোনের যে আশ্চর্য হতে হয়। তবে একটা মাসী আছেন, মনোরমা মাসী, সংক্ষেপে মনোমাসী। তিনিও প্রায় একা থাকেন নিজের ছোট বাড়িতে—স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। যেমন গম্ভীর তেমনি রাশভারী। ছোটরা মনোমাসীকে একেবারেই পছন্দ করে না। অত হাঁড়িমুখ কেন? হেডমিস্ট্রেস মার্কা মাসী ভালো লাগে না। বুবি বলে, ওকথা বলিস না মালা, আমাদের স্কুলের বড়দির মুখ কী সুন্দর মানে কত মিষ্টি কথা বলেন আর ভালবাসেন। মালা বলে, তাহলে ঐ এক বা দু'জন, আর সব হাঁড়িমুখ। তুই যেন আবার বলে দিস্‌না। তাই মাসী কদাচিৎ এলেও ছেলেমেয়েদের আপত্তি নেই কিন্তু নকুড়মামা এলে যদি কম সময় থাকেন তাহলে স্কুল

পালাবার ধুম পড়ে যায়। যতটুকু নকুড়মামার কাছে থাকা যায় বেশ ভাল লাগে।

মা মাঝে মাঝে রাগ করে বলেন : আমার একটিমাত্র ভাই, সে এলে একদণ্ড তাকে পাবার যো নেই তোদের জন্য। দরকারী কথাও তো থাকে।

ঝুনু বলে: মা, কাল সারারাত ভাই-এর সঙ্গে গল্প করেছ, মামাকে ঘুমুতে দাওনি। আমরা গেলেই তোমার রাগ কেন?

মা হেসে বলেন : ওরে পাজীরা, রাতেও পাহারা দিস তোরা, দাঁড়া, এবার নকুড় এলেই ভূত দেখাতে বলবো।

ভূতের গল্প অবশ্য মামার মুখে ফেরে। একবার অনেকদিন আগে বলেকয়ে আমাদের ভূত দেখিয়েছিলেন। দূরের ছাতে—ওটা মনে হলো ছটকুদের ছাত—ওখান থেকে সেই ভূতটা নামছিল—চোখে দেখার আগে থেকেই বর্ণনা শুরু হয়ে গিয়েছিল আর সাবধান বাণী উচ্চারিত হচ্ছিল তাই আর ভাল করে চোখ খুলতে পারেনি ছোটরা। হুড়মুড় করে সব জাপটা-জাপটি করে খাটের উপর চোখ বন্ধ করে পড়েছিল,—কতক্ষণ তা নিজেরাও জানে না। চোখ খুলে দেখলো সূর্যমামা খুব রেগে, তার মানে প্রবল তেজে ঘরে ঢুকেছেন। য়্যাঁ কি হলো, কটা বাজলো, স্কুল। স্কুল কি হবে?

ভাগ্যি সেটা রবিবার ছিল!

এবার পুজোয় নাকি নকুড়মামা আসবেন না। তাঁর কি কাজ পড়েছে। শ্রীলঙ্কায় যেতে হবে। দলের মুখ ভারী হয়ে উঠেছে। কেন আসবেন না। কাজ তো সব সময়—পুজোর ছুটি নেই?

মা বলেন, তোমরা যা জ্বালাতন করো আমার ভাইটাকে—।

ওসব ছাড়ো তো মা! আজই একটা চিঠি লিখে দাও মামাকে—

ওসব লঙ্কা, সরষে, তেজপাতা রেখে—দাও—যেন ঠিক সময় এসে পড়েন। লঙ্কা? সেটা কি একটা নাম হলো একটা দেশের? যত সব বাজে জায়গা।



আমার একটিমাত্র ভাই, সে এলে একদণ্ড তাকে পাবার যো নেই তোদের জন্য।

মা বলেন, না, কাজকর্ম কারুর থাকবে না কেবল তোমাদের নিয়ে বসে থাকতে হবে।

তা তো—একটু হবেই মা!. আমরা কি কেবল স্কুলে যাবো আর পড়া মুখস্থ করবো? তোমরা বলবে, নম্বর তুলতে হবেই বেশী করে। তাই শুনবো? বারে—বেশ তো!

মা হেসে ফেলেন : আচ্ছা আচ্ছা বলবো, বলবো যেন পূজোর সময় এখানে থাকে নিশ্চয়।

পূজোয় কি হবে এইসব ফর্দ প্রায় রোজই হয়—নিজেরা ও বন্ধু-বান্ধব মিলে কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেন কিছুই মেলে না। এতগুলো জায়গায় যাওয়া, ভিড় সামলে এত প্রতিমা দেখা—আবার বাবার রাশভারী কণ্ঠ শোনা যায়—'ফর্দে' যেন লেখা হয় রাত্রিবেলা কোনো বড় বড় চত্বরে যাওয়া হবে না। গাড়ী দু'মাইল দূরে রেখে ভিড় সামলে দলকে—নিয়ে ঘোরা সম্ভব নয়—সব দিনেরবেলা করতে হবে।

ছোটরা ভাবে এসব আবার একটা কথা হলো নাকি? রাতে আলোর জৌলুস, জামাকাপড়ের বাহার, কত চেনা মানুষের সঙ্গে দেখাশোনা, স্টলে স্টলে মনের মতন জিনিস কেনা। এসব আবার দিনে হয় নাকি? বাবার যেমন কথা! আসুক নকুড়মামা—কী জানি আবার শ্রীলঙ্কা না কি যেন মা বলছিলেন···।

পুজো এসে পড়ছে। জামাকাপড় জুতোর সাজপোষাকের বাক্স, প্লাস্টিকের প্যাকেটে বাড়ি ভরে যাচ্ছে। মনে মনে খুশীও হচ্ছে সবাই —কিন্তু নকুড়মামার চিঠি বা আসার খবর কেন এত পেছিয়ে যাচ্ছে—ছোটদের চিন্তার অন্ত নেই। মাঝে মাঝে মার কাছে গিয়ে বলছে : আচ্ছা, নকুড়মামার চিঠি আসেনি মা? কবে আসবেন?

মা হেসে বলেন : আসবে তো ঠিকই, তবে বড় ব্যস্ত থাকে কাজে, কত দায়-দায়িত্ব অফিসের, আমার ভাইকে সোজা লোক ভাবো নাকি?

সোজা বাঁকা আবার কি? তোমার ভাই তো সোজাই, একেবারে

ছ' ফুট লম্বা। আমার তো মনে হয় আরো বেশী—কিন্তু সে কথা থাক, কবে আসছেন তাই বলো!

আমি তো এখনও চিঠি পাইনি।

এইসব হৈ-চৈ হাঙ্গামা জিনিসপত্র কেনার মধ্যে পূজো এসে পড়লো।

ছেলেমেয়েদের কলরব: কই মা, তুমি বলছ না কিছু? কবে আসবেন মামা?

বিরক্ত হয়ে মা বললেন, কাল!

ও মা! মার কথা একেবারে সত্যি! তখনও ভালো করে ভোর হয়নি।

ঘুমের মাঝে ছোটরা শুনলো: দিদি কই? কই রে ছোটোর দল!

নকুড় এলো, এত সকালে? মা ছুটলেন।

মামা তো জাঁকিয়ে আসর বসিয়েছেন—রাত পোহালেই সপ্তমীর বাজনা। নতুন জামা-কাপড়ে সাজা হবে—এমন একটা উসখুস করা মন নিয়ে সবাই মামাকে ধরেছে: গল্প তোমার থাক—আমাদের ব্যবস্থা করো; বাবা বলেছেন দিনেরবেলা সব সারতে হবে। তা কি হয় মামা, বলতো?

হ্যাঁ বলতো বলতো—কোরাসে গলা উঠলো।

মামা বললেন, তাই তো, খুব অন্যায়—কিন্তু দেখ, বাবার কথা শুনতে তো হবেই, আবার পুজো দেখার ব্যবস্থা রাতে করতে হবে। বড়ই মুশকিলের কথা—তাই না? আচ্ছা···

—না মামা। আচ্ছা নয়, একেবারে ঠিক করতে হবে আমরা রাতে পুজো দেখবোই! দেখবো!!

—আচ্ছা তাহলে আজ গল্প থাক—।

—না না, তা কি হয়? বলো! বলো!!

—আমি যেখানে থাকি—সেখানে···

—সেটা আবার কোথায়? তোমার সেই শ্রীলঙ্কা?

—দূর, ওসব থাক—তাহলে শোন! রাত-বিরেতের কথা বাবাকে বলা হবে তার দায়িত্ব নেবে কে?

দূর থেকে মা চেঁচিয়ে বললেন: তুই যাস তো! ওদের বাবা যা বলবেন তাই হবে।

দু'বার ঢোঁক গিলে মামা বললেন: আমি যেখান থেকে এলাম, জায়গাটা খুব ভাল কিন্তু খুব ভূতের উপদ্রব। আমার সঙ্গে দেখাশোনা কথাবার্তা হতো, ঝগড়াও বাদ যেতো না। যখন ভাব হতো তখন এসে খেলতে বসতাম, দেখতে তো খুব খারাপ ওরা। ছবি দেখেছিস তো? আমার মতো তাগড়াই চেহারাও থুবড়ে যেতো, তবে 'ভয় পাচ্ছি' বলতাম না। মনে কর একটা মানুষ আমি আর অন্ততঃ পাঁচ ছ'টা ভূত আমায় ঘিরে বসেছে। খেলা হচ্ছে। ভয়ে ওদের মুখের দিকে তাকাতে পাচ্ছি না অথচ খেলতেই হবে। আবার নাকী সুরে ওরা কত কথা যে বলে চলেছে বিশেষ এই পুজোর সময় ওরা কোথায় কোথায় যাবে···মানে বেড়াতে যাবে···কোলকাতা আসতে পারে?

মামা বললেন: অবশ্যই পারে—তাছাড়া পুজোয় কোলকাতা তো দেখবার আছেই। হ্যাঁ, আবার তাসে তো ওদের হার হলো, আমার জিত। তবে আমার দলে একটা ভূত ছিল মোটে। সে বললে, দেখ, তোমায় জিতিয়ে দিয়েছি—আমি কিন্তু পুজোর সময় তোমার সঙ্গে ঘুরবো কোলকাতায়। কি উত্তর দেবো বুঝতে পারছি না। তখন অন্যগুলো আর সভ্যভব্য নেই, নিজ মূর্তি ধরেছে—বলছে, তা কি হঁয়। আমরা কি এঁখানে ভূঁতের মত বসে থাঁকতে পাঁরি?

—এই কথা বলেছে ওরা? দল বেঁধেই আসবে?

মামা একটু ভেবে মুখটা শুকনো করে বললেন: তাই তো ভাবছি, কি করা যায়!

—মামা, তোমার কথা আমরা বিশ্বাস করি তাই সত্যি বলো।

কোনোরকম সম্ভাবনা আছে ?

মামা হেসে বললেন ঃ সম্ভাবনা—বানান বলতে পারিস ? তা যা হয় করিস—কিন্তু যখন স্বীকার করলাম ওরা পুজোয় আসুক কোলকাতায় আমিই দেখাশোনা করবো—তখন চুপ করলো। যাক গে, এখন আমরা অন্য গল্প করি আয়। সমুদ্র দেখেছিস তো তোরা ?

—কই না !

—কেন সেবার তোরা গিয়েছিলি না, পুরী না গোপালপুর—আর কি যেন সমুদ্রোপকূল জায়গায় ?

—না, না, একেবারে না। সমবেত কণ্ঠে বললে।

—দেখতে ইচ্ছে করে না ? দিদিকে বলবো তোদের একবার বেড়িয়ে আনতে।

—যাক গে মামা, তাহলে তোমার ওঁরা কি করবেন ? পুজোয় আসবেন ?

—না আসতে দিলে আমার ঘাড়টা মাথার ওপর থাকবে ?

ছোট্ট পুনুর চোখভরা জল !

—না না মামা ওদের টিকিট কেটে দিও না।

—হ্যাঁ মামা, ওসব বন্ধ করো, সত্যি বলছি ভয় করে, পুজোয় এসে ওরা কি করবে ? পরে হ্যাঁ পরে—ওমা ! ব্যস ঝুনু কেঁদে ফেললে।

—ওমা কাঁদছো সব ? কী ভীতু সব ?

বাবার গলা শোনা গেল—কি হয়েছে সব ? কেন মামা তো জলজ্যান্ত সামনে বসে।

নকুড়মামা বললেন ঃ ভয় কি ! যার যা ইচ্ছে করবে। কেউ তো কারুর সঙ্গে ঝগড়া করছে না কেউ কারুর জিনিস নিচ্ছে না…

—ওমা ! দেখো মা, মামা কি বলছে ; কান্না ভেজা পুনুর গলা।

ঝুনু সাহস করে বলে, সব তোমার বাজে কথা, ভূতেরা নাকি গাড়ী, ট্রেন করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় আসতে পারে ?

খোকন বললে ঃ সত্যি মামা ? না, ভয় দেখাচ্ছ ?

মামা বললেন ঃ কোনদিন ভয় দেখিয়েছি ? তবে ভয় পাচ্ছ কেন ? ওরা তো নিশাচর। রাতে বেরোয়—তোমরা তো দিনে,—ভয় কি ?

—বা, আমরা পুজোয় সব সময় বেরোবো, দিনে-রাতে আবার কি ?

বাবা চলে যাচ্ছিলেন সামনে দিয়ে—কি হে কিছু পারলে ?

নিশ্চয়ই ! মামা আমাদের বললেন, ওদের সঙ্গে গোলমালে কি দরকার বাবা। আমরা সকাল থেকে সাজ-পোষাক করে সন্ধ্যা অবধি সারা কোলকাতা ঘুরে সন্ধ্যেবেলা বাড়ি এসে টি. ভি. দেখবো।

সকলে বললে ঃ তাই ভালো ! কিন্তু তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে, তাস খেলতে যাবে না।

—না, না, না, এই তিন সত্যি করলাম, নকুড়মামা বললেন।

ওরে বাব্বা

মনে হবে গল্প বলছি।

একেবারেই না।

মনে হলে হাড় হিম হয়ে যায়।

ভূত? প্রেত? দৈত্য, দানব?

আরে, ওসব তো আজকাল হাতের মধ্যে এসে গেছে—মানে, বন্ধুত্ব করা যায়, শাসনও করা যায়। হাসপাতালের ভূতগুলোকে তো এমন চিট করা যায় তারা আর সহজে ঘেঁষতে চায় না। নতুন রোগী গেলে ভাব জমাতে আসতেও ইতস্তত করে।

তাহলে কি!

ভূত প্রেত ওসব বাদ।

মজা করতে গেলে সাজা হয় একটা কথা আছে না, এ ও প্রায় সেই রকম ঘটেছিল।

সেদিন হয়েছে কি—মিনিদের নতুন বাড়িতে গেছি। যেখানে বাড়ি তৈরী হয়েছে তার কাছাকাছি তখন খুব বাড়ি তৈরী হয়নি। হবে, হচ্ছে এইরকম তোড়জোর হচ্ছে। অন্য বাড়িগুলো ভর্তি—তবে খাস কলকাতার মত গা ঘেঁষাঘেঁষি করে নেই। ছাতে ছাতে চেষ্টা করে যাওয়ার মতও নয়। আর তা হলেই বা কি হত। কিছুই হত না!

সেদিন নতুন বাড়িতে গিয়ে বেশ ভালো লাগছিল। অনেক জায়গা। গাছপালাও লাগানো হয়েছে। ফুল ফুটেছে ছোট ছোট গাছে। বোগন ভ্যালিয়া সোজা উঠে গেছে, ছাতে শুয়ে পড়েছে। আর পেঁপে গাছটার ফলন দেখে তাজ্জব হয়ে গেছি। একটা বড় কুমড়োর মত পেঁপে আগে দেখিনি। মনে হল অনেকদিন আগে বাবার সঙ্গে মধুপুরে

বেড়াতে গিয়ে গাছে খুব বড় পেঁপে দেখেছিলাম—খেয়েওছিলাম। খেয়ে খুব মিষ্টি লেগেছিল। সব দেখেশুনে আর কলকাতার গায়ে এমন জনযানবহুল নয় অথচ শান্ত পরিবেশে মনটাও প্রফুল্ল হয়ে উঠলো।

মিনির ঠাকুমা বললেন: আজ আর গিয়ে কাজ নেই। কাল যেও, বাড়িতে খবর দেবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

বেশ ভালো লাগছিল তাই রাজী হয়ে গেলাম। মনে হল যারা কলকাতার মধ্যেখানে থাকে তাদের ভালো লাগবেই।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে।

আজকাল সব বাড়িতেই একবার রান্না দেখি—আর সেটা ফ্রিজে তোলা থাকে, খাবার আগে নামিয়ে গরম করে খাওয়া।

এখানেও তাই শুনলাম। কাজেই ও কাজও নেই।

মিনি মার কাছে পড়ছে। ওর বাবা এদিক-ওদিক করছেন। দাদু তাঁর বন্ধুর সঙ্গে বাইরে বসে কথা বলছেন। আমি ঠাকুমার সঙ্গে গল্প করছি। বলছেন, এ বছর তোমার দশ ক্লাস পরীক্ষা হবে তো? কেমন পড়াশুনো করছ? স্কুল কি অনেক দূর? একা যাও, না, পাড়ার ছেলেরা মিলে যাও—ইত্যাদি।

—পাড়ার ছেলেরা ক'জন এক হয়ে যাই। ফিরিও একসঙ্গে, না হলে মা ভাবেন। বোনের তো স্কুল-গাড়ি আসে।

ঠাকুমা কত সুন্দরভাবে বোঝাচ্ছেন; দেখো, এই জায়গাটা কেমন ভালো। ঘিঞ্জি নয়। দিবারাত্রি গাড়ি চলাচল নেই। মধ্য কলকাতার কথা এখন মনে হলে গা শিরশির করে। পুরোনো বাড়ির কথা মনে হয়। সারারাত ঘড়ঘড়িয়ে গাড়ি চলে। ঘুমের কি ব্যাঘাত হয়! ভোরের দিকে ঘুম আসতো।

কিন্তু উপায় নেই, কাজ আছে আর তোমাদের দাদু তো সামান্য আলোর রেখা দেখতে পেলেই 'ফজীর' বলে উঠে পড়েই চা চাইবেন। তার মানে 'ভোর হলো দোর খোলো', চা দাও! কিন্তু এখানে রুটিন

একরকম হলেও ঘুমের ব্যাঘাত হয় না—সেটা নির্ঝঞ্ঝাট। মানে সারারাত গাড়ির ঘড়ঘড়ানি, লরির শব্দে বাড়ি কেঁপে ওঠা নেই। বেশ সুস্থ নিদ্রা হয়। ভাল আছি, শান্তিতে আছি।

এইসব একমনে শুনছি। আমার বেশ লাগছে। এসব শুনতে শুনতে মনে হল—কে বা কারা যেন সদরের ছোট গেট খুলে ঢুকলো ভিতরের দালানে। আবার গেট বন্ধ করার শব্দ হলো।

আমি বললাম, কারা যেন এলো!

ঠাকুমা এক মনেই এখানের বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছেন। চেহারাটি কি সুন্দর, কথাগুলোও শুনতে ইচ্ছা করে। আলো পড়ে গলার ও হাতের গহনাগুলি চিক চিক করছে। আবার বললেন ঃ তোমার দাদুর কাছে কেউ এসে থাকবে।

আমি পিছন দিকে তাকিয়ে দেখলাম—তিন-চারজন মানুষ। খুব বেশী বয়স না—দাদাদের বয়সী হবে, দাদার বয়স বাইশ-তেইশ। দু'জন ঘরে ঢুকে কি বলছে আর দু'জন মিলিদের ঘরে ওর মাকে কি বলছে। মিলির মা ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

হঠাৎ কানে এলো—'একটিও কথা বলবেন না। কোন রকম অসুবিধার সৃষ্টি করবেন না। যা বলছি তাই শুনুন। তাহলে আমাদের—

কথাগুলো কেমন পরিবেশের সঙ্গে বেমানান মনে হলো। আবার মাথা উঁচু করে দেখবার চেষ্টা করলাম। কেমন যেন তর্ক-বিতর্কের শব্দ আসছিল। কিন্তু ঠাকুমার কথায় আবার ফিরে মন দেওয়ার তিন-চার মিনিটের মধ্যেই তারা এ ঘরে ঢুকেই ঠাকুমাকে জোর গলায় বলল ঃ আলমারীর চাবি দিন। তাড়াতাড়ি দিন আর গায়ের ঐসব কি পড়েছেন চট করে খুলে দিন।

ঠাকুমা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। আর একজন বলে কি—আমাদের কথা শুনতে পাননি নাকি? আমরা খুলে নেবো গায়ে হাত দিয়ে—।

ভূত দেখার মত ভয়ে বিস্ময়ে ঠাকুমার মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। ও ঘর থেকে মিলির মা বলে উঠলেন: মা চাবি দিয়ে দিন আর ওগুলোও খুলে দিন।

চাবি দিতে হল না। বিছানার উপরেই ছিল,—তুলে নিয়ে একজন আলমারীটা খুলে ওলট-পালট করতে করতে পকেটে পুরতে লাগল—ভয়ে বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলাম—গোছা দুই বড় বড় নোটের তাড়া—আর এটা ওটা—তুলছে, পকেটে ফেলছে। আর একজন ঠাকুমার সামনে দাঁড়িয়ে—'দিন! দিন!' বলছে।

ঠাকুমা আস্তে আস্তে গলার হার, হাতের চুড়ি সব খুলে দিলেন—ঠাকুমার ঐসব চেহারা দেখে আর এই ব্যাপারে—আমি চিৎকার করে কেঁদে উঠতে যাচ্ছি—অন্য একজন কাজ শেষ করে এসে বলল: কি হে ছোকরা, পকেটে কিছু আছে নাকি? আজকাল স্কুলের ছেলেদেরও পকেট ভারী থাকে—তারাও নেশা-টেশা শিখেছে যে!

আমি জবাব দেবার আগেই অন্যজন বলল: এই, চলে আয়, যা করার হয়ে গেছে—ওটা একটা পুঁটি মাছ, কি হবে?

ঠাকুমা যেন সম্বিদ ফিরে পেয়ে একবার বলে উঠলেন: অপূর্ব!

একজন বলল: ওঃ, ছেলেকে ডাকছেন! আমরা চলে গেলে তিনি আসবেন। হাত-মুখ বাঁধা তার।

যেমন এসেছিল তেমনি তারা দু'ঘর থেকে যা পারল পকেটে পুরল—হাত ভর্তি করে মূল্যবান জিনিসগুলো নিয়ে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেট খুলে চলে গেল।

চেষ্টা করে ডাকতে গেলাম—কাকু! কাকিমা! মিনি! না, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না।

চেষ্টা করে উঠে গিয়ে যা দেখলাম—কাকুর হাত তখনও বাঁধা। আর অলংকারশূন্য হাতে কাকিমা চেষ্টা করছেন বাঁধন খুলবার। আর ওদিকের ঘরে চেয়ারের সঙ্গে দাদু বাঁধা। দাদুর বন্ধুর মুখ বাঁধা।

ঠক ঠক করে কাঁদতে লাগলাম। মিনিও মাটিতে বসে, তার গলার



উঠে বোস, দুধ খাও—

আওয়াজ নেই। কিন্তু তারপর আর কিছু বুঝতে পারছিলাম না। একমাত্র কাকিমাকেই দেখলাম আশ্চর্য হয়ে। এক-এক করে সকলের বাঁধন খুললেন না কাটলেন বোঝা গেল না। দাদুর বন্ধু বেড়াতে এসে এমন বিপদে পড়বেন ভাবেননি। বয়স্ক মানুষ—আর বসে থাকবার সামর্থ ছিল না। মেঝের কার্পেটের উপর শুয়ে পড়লেন।

সিনেমার দেখা ডাকাতি?

কতক্ষণ পরে আবার সবাই বসলেন বা আশ্বস্ত হলেন জানি না। তখন বাড়িতে কিছু লোকজন এসে পড়েছে—আর এই নিয়ে দারুণ হৈ-চৈ ব্যাপার হচ্ছে।

মনে হচ্ছে আমার কোন জ্ঞান ছিল না, শুয়েই ছিলাম। হঠাৎ দেখি মাথার কাছে মিনির মা বলছেন: বেড়াতে এসে কি বিপদে পড়েছিলে না, অসীম! ওঠো, এই গরম দুধ খাও—ভয় পেও না। সবাই এখন সুস্থ।

খুব আস্তে বললাম: বাড়ি যাব, কাকিমা!

—হ্যাঁ, যাবেই তো! উঠে বোস, দুধ খাও—সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

দুধ খেলাম—কিন্তু কী সাংঘাতিক আতঙ্কে ছিলাম। ভয়ে ভয়ে যেদিকে তাকাচ্ছি সেদিকেই কেমন দুর্ঘটনার ছাপ। সবাই আতঙ্কে ম্রিয়মান। কেবল একমাত্র কাকিমাকেই দেখলাম অবিচল।

হ্যাঁ, সে রাতে বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। অনেকদিন ঘুমাতে পারিনি। তবে কাকিমার কথাও ভুলতে পারি না। এরকম সাহসিকতা না থাকলে সেদিন সকলেই বোমা বা অস্ত্রের আঘাতে হত বা আহত হতেন।

তাহলে বলো, ভূত, প্রেত, দৈত্য-দানা এত তাড়াতাড়ি একটি সুস্থ সংসারে ঢুকে তছনছ করতে পারে পাঁচ থেকে সাত মিনিটের মধ্যে?

তাই মনে হয় এদের থেকে তাদের মুখোমুখিতে কি আশঙ্কা বেশী! এত অল্প সময়ে···? বলো, কি বলছ তোমরা?

তোমায় আমি এখনও ভুলিনি

সে কথা ভাবলে মনে হয় যেন আগের জন্মের কথা। দিনগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে চলে গেছে। পৃথিবী, মানুষ প্রকৃতির চেহারাও কত বদলে গেছে। মিনিট, ঘণ্টা রাত-দিন পার হয়ে হয়ে বছরের পর বছর কেটেছে। সে এখন আছে না নেই—সে কথাও জানি না। কিন্তু তাকে আমি ভুলিনি—ভুলতে পারি না যেন।

অ-নে-ক দিনের কথা। বড় ব্যধি থেকে মুক্তি পেলাম। চারিদিকে যত তাকাই, সব নতুন বলে মনে হয়। জানলা দিয়ে পাশের বাড়ির বন্ধু রেণুকে ডাকলাম। তখনও ঘর থেকে বাইরে যাবার অনুমতি পাওয়া যায়নি। রেণু জানলায় এসে দাঁড়ালো। আশ্চর্য মোটা-সোটা রেণুর এ কি চেহারা! অত ফর্সা রং তাও মলিন। গায়ের ফ্রকটা ঢিলঢিলে। একটু হাসলো রেণু; অনেকদিন পরে দেখলাম। রেণুও অবাক হয়ে দেখছে, হয়তো সেও তিন মাস পরে দেখছে আর ভাবছে আমারই মত। কেউ আমরা কথা বলতে পারছি না। কেন পারছি না হয়তো জানি না বা বুঝতে পাচ্ছি না। দু'জনে দু'জানলায় দু'জনের দিকে চেয়ে আছি।

দিদি বললেন: রেণু কেমন আছ? তোমার বন্ধুও এই দু'তিন-দিন আগে ভাত খেয়েছে। হাঁটতে পারে না, দু'টোর বেশী তিনটে কথা বললে খেয়ে ওঠে, চোখ বন্ধ করে ফেলে।

ওদিক থেকে রেণুর মা বললেন: ঐ একই অবস্থা ওরও।

খুব সাবধানে থাকতে বলেছেন ডাক্তার। এই রোগ যাবার সময় অঙ্গহানি অথবা অন্য ক্ষতি করে দেয়। বেশ, দু'বন্ধুর দেখা তো হোল,

এবার যে যার শুয়ে পড়গে। বিকেলে আবার জানলায় দাঁড়াবে। রেণুর মা রেণুকে ধরে নিয়ে গেলেন। আর দিদিও আমায় নিয়ে খাটে বসিয়ে বললেন ঃ অনেকক্ষণ জানলায় দাঁড়িয়েছ এবার—বিছানায় বোস। খাবার এখনও আধ ঘণ্টা দেরী আছে। রেণুর সঙ্গে কথা বলা হলো না বলে মন খারাপ হলেও দুর্বলতা শরীর আচ্ছন্ন করেছে—শুয়ে পড়লাম।

বেশ কয়েকদিন কেটে যাবার পর—আবার জানলায় দাঁড়ালাম। রেণু হেসে হাত দিয়ে ডেকে বললে ঃ আয় না! বললাম ঃ হবে না, যাবার অনুমতি মিলবে না।

রেণু খুব সুন্দর দেখতে—কিন্তু মাথাটা ন্যাড়া করে দেওয়াতে আর রুগ্ন চেহারাতে এখন যেন কিরকম দেখতে লাগছে, যেন সেই চেনা রেণু নয়।

তারপর একদিন আমরা ভাল হয়ে উঠলাম, আবার ধীরে ধীরে পুরোনো জীবনযাত্রা শুরু হোল। কিন্তু ডাক্তারবাবু বললেন ঃ বাইরে ঘুরিয়ে আনতে। দু'বাড়িতে একই কথা।

দু'বাড়ির এক পরামর্শে একই জায়গায় যাওয়া হোল। কাছের গোড়ায় মধুপুরে। মাস দুই থাকতে হবে। অতদিন তো বাড়ির পুরুষরা এক নাগাড়ে থাকতে পারবেন না—। বাড়ি দুটো পাশাপাশি। তবে একজন করে পালাক্রমে থাকবেন—দুটো বাড়িই দেখাশোনা করবেন।

আমাদের বড়দের কথার দরকার ছিল না। দুই বন্ধু এক জায়গায় থাকবো, তার চেয়ে আনন্দের আর কি আছে! তাই হোল। দুটো পাশাপাশি বাংলো বাড়িতে আমরা রইলাম। ফুলের রাজত্ব যেন! সকাল থেকে খেলা শুরু ঘরে-বাইরে। বকুনি দিয়ে, ডাকাডাকি করে বড়রা খাওয়ান। কি সুন্দর গাছ আলো করে ভেলভেটের মত বড় বড় গোলাপ, বড় গাঁদা, জানা না-জানা নামের গন্ধওয়ালা গন্ধবিহীন সুন্দর দেখতে ফুল—ফুলের সমারোহ। আর শহরে যে-সব দেখতে

পাই না—সে-সব সব্জীর গাছ কত যে !

রেণু একদিন চেঁচিয়ে ডাকছে : শীগ্‌গির দেখবি আয়, কি সুন্দর টমেটো গাছে ফলে আছে। সত্যিই তো, শহরে আমরা কি দেখতে পাই ? ঝুড়ি করে পুরোনো সব্জী বিক্রি করা ছাড়া ? ঝুড়ি বোঝাই করে সীম তুলে এনে বললাম : কাকিমা দেখ কত এনেছি। কাকিমা হেসে বললেন : বেশ, বাজারে আর যেতে হবে না।

প্রকৃতির সৌন্দর্যে আমরা মেতে আছি—আর আমাদের আর একটি বন্ধু জুটে গেছে, ওখানকার একটি মেয়ে। তার বাবা রেলওয়েতে কাজ করেন। ছোট্ট কোয়ার্টার। মা, বাবা, ভাই, বোন থাকে। আমাদের সঙ্গে ওদের খুব ভাব হয়ে গেছে। ওর নাম সুধা।

আমরা তিনজনে বেড়াতে বেড়াতে কতদূর চলে যেতাম—যেখানে পাহাড়টা মনে হয় এখানে, হেঁটে ছুঁতে গেলে যেন কতদূর চলে যায়। ঝিরঝির করে ঝরণার জল মাটিতে পড়ে তিরতির করে কেমন চলে যাচ্ছে। জলে হাত ডুবিয়ে মনে হোত এমন স্পর্শ কোনদিন পাইনি।

সুধা আমাদেরই হয়ে গেল। প্রায় সব দিনই সুধা আমাদের সঙ্গে বেড়াতে যেতো। মাঝে মাঝে আমরা আটকে রাখতাম যেতে দিতাম না। যে কাজ করতো সে সুধাদের বাড়িতে খবর দিয়ে আসতো—সে আমাদের কাছে আছে।

একদিন আবার তিনজনে হাঁটতে হাঁটতে কতদূর গিয়ে পড়লাম—পথ হারিয়ে। সুধা বললে, আমি যদিও একা কোনওদিন আসিনি তবে ঠিক চিনে বাড়ি নিয়ে যাবো। কিন্তু কি হোল, যত যাই রাস্তা ফুরোয় না। ফিরতে গিয়ে মনে হলো—না এ পথে আমরা কোনদিন আসিনি তো। আর তো ঘর-বাড়ি ছেড়ে কোন কুঁড়েঘরও তো চোখে পড়ছে না। তাহলে কি হবে ?

সকালে খাবার খেয়ে বেড়িয়ে দুপুর হয়ে গেল। ক্ষিদে-তেষ্টায় শরীর ঝিম ঝিম করছে। মনে হচ্ছে আর আমরা বাড়ির লোকদের দেখতে পাবো না। কাছাকাছি একটা পাহাড় তার গা দিয়ে ঝরণা

নেমেছে, সেইখানে গিয়ে তিনজনে জল খেলাম। কিন্তু বিকেল হয়ে আসছে দেখে খুব ভয় পেয়ে তিনজনে কাঁদতে আরম্ভ করেছি—তখন দেখছি দূরে দু'তিনজন মানুষ আসছেন। আমরা সেই দিকে ছুটলাম। রেণু বলছে ঃ ওরা যদি আমাদের ধরে নিয়ে যায় আর বাড়ি যেতে না দেয়?

ভয়ে আমি ডুকরে কেঁদে উঠেছি। এমন সময় ঐ লোকজনরা কাছে এসে পড়েছেন—ওমা! কি আরাম! একজন সুধার বাবা, আমার কাকামণি আর পুলিশের লোক।

সকলে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। সুধার বাবা বললেন ঃ তুমি বুঝি নিয়ে এসেছ সুধা? উঃ কি ভাবনায় ফেলেছিলে। যাক চলো, চলো সব। আমি অপিস থেকে চলে এসেছি—তুমি ওদের সঙ্গে এসো আমি বাড়িতে সবাইকে বলে যাচ্ছি।

সুধার বাবা চলে গেলেন নিশ্চিন্ত মনে। সকলে মিলে আসতে আসতে একটা খাবারের দোকানে বসে খাওয়া হোল। আমরা মিঠে কড়া বকুনিও খেলাম। সুধা বেশী।

সুধার জন্য কষ্ট হচ্ছিল। কবে থেকে সে আমাদের ঝরণা আর পাহাড়ের কাছে নিয়ে গিয়ে দেখাবে বলেছিল আর সেই কিনা পথ ভুলে গেল? কিন্তু আমাদের যে কি অবস্থা হয়েছিল মনে হলে বুকের মধ্যে ঢিব ঢিব করে যেন আর মনে হয় মার কাছে ছুটে যাই।

সেদিন বাড়ি ফিরে অনেক কিছু হলো। শুনেছি সুধার মা খুবই বকেছেন। মেরেছেন যেন একটু। জীবনে সুধা কখনও মার খায়নি। আজ এত মন খারাপ, শরীর খারাপ তার উপর—। অভিমানে সুধা বাড়ি থেকে বেরোলো না।

পরের দিন আমরাই গেলাম—কেন সুধা আসছে না, সুধা বিনা মধুপুরের সব অচল যেন। তাছাড়া সেদিনের সে সময়ে সুধার উপর একটু রাগ হলেও—সুধাকে আমরা কত ভালোবাসি যে! তাই সুধা না হলে কি চলে? ও যে আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু। রেণুর চেয়ে সুধা

যেন ক'দিনে অনেক বেশী আপন হয়ে উঠেছে।

সুধার মা বললেন : তোমাদের খুব কষ্ট হয়েছে, ও তো সব চেনে না আবার তোমাদের নিয়ে গেছে—কতদূর চলে গেছে ভুল হবে না? খুব কষ্ট হয়েছে তোমাদের না?

—সুধা কই মাসীমা? সেদিনের কষ্ট আমরা ভুলে গেছি তবে মায়েরা খুব ভাবছিলেন, বকুনিও খেলাম। তা হোক—কত বকুনি খাই। আমরা এখন ভালো আছি—খুব বড় অসুখ থেকে উঠেছি বলে মায়েদের খুব ভাবনা।

—সুধার জ্বর হয়েছে, আবার আমার কাছে বকুনি খেয়েছে তো! কাল তো কম ছিল, আজ জ্বরটা বেশী মনে হচ্ছে। ঐ ঘরে শুয়ে আছে, যাও—।

সত্যি সুধার জ্বর বেশী। চোখ লাল টকটকে। মুখটা যেন ফোলা।

—কিরে সুধা খেলতে যাবি না?

সুধা চোখ খুলে আমাদের দেখে একটু হাসলো।

—চল সুধা আমরা খেলি গে। এইখানেই খেলি চল।

সুধা একটু হেসে চোখ বন্ধ করলো। আমাদের মন খুব খারাপ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ বসে চলে এলাম। সুধা না থাকলে খেলা জমে না। কোথাও যাওয়া হয় না—সুধাই তো আমাদের চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। তবু সুধা কি শান্ত, কি নম্র, কত সহযোগ করে চলে। কবে যে ভাল হবে সুধা।

না, সুধা ভাল হলো না। রোজই জ্বর বাড়তে থাকে। ডাক্তার আসেন ওষুধ দেন, কিন্তু কিছুতেই কমাতে পারেন না। আমাদের মন খুব খারাপ। তবুও রোজ সুধার কাছে যাই। একটু কথাও বলি। ও হাসে, আস্তে আস্তে বলে—'ভাল হলে আবার খেলবো কিন্তু কোথাও যাবো না আর।'

সুধার জন্য আমাদের মনে খুব কষ্ট, কিছুতেই কমছে না। ডাক্তার

কিরকম অসুখ সারাতে পারে না ? কেবল লাল ওষুধ শিশিতে আর একগাদা নানা রকমের নানা রংয়ের বড়ি। ওতে কি আছে যে, অসুখ সারবে ? আমরা ভাবি।

বেশ ক'দিন কেটে গেল। আগে তবু সুধা একটু-আধটু কথা বলতো, এখন কেবল একটু হাসে। আমাদের যে কি প্রচণ্ড মন খারাপ তা বলা যায় না। আমরা রোজ গিয়ে ওদের দালানে বসে থাকতাম। বলতাম : ঠাকুর, সুধাকে ভাল করে দাও।

কোলকাতা থেকে বাবার জরুরী খবর গেল, দু'তিনদিনের মধ্যে ফিরতে হবে—দাদু হঠাৎ খুব অসুস্থ। ডাক্তার ভাল বলছেন না।

আমাদের যেতে হবে সুতরাং রেণুরা আর থাকবে কি করে ? দুটো পরিবার একসাথে ছিল তাই চলে আসতে হবে আর অনেকদিন ওখানে থেকে মা ও কাকিমা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। আমাদের খুব মন খারাপ হয়ে গেল—কেবলই বলতাম : ঠাকুর সুধাকে ভাল করে দাও। মাঝে মাঝে রাগ হতো—ঠাকুর কি শুনতে পাচ্ছেন না ? সুধা ভাল হচ্ছে না কেন ?

এদিকে আবার যাবার কথা। রেণু আর আমি বললাম : আমরা যাবো না। মাসীমার কাছে থাকবো, সুধা ভালো হলে যাবো।

ছোট মনের ছোট্ট আশা-আকাঙ্ক্ষা—সুধাকে ছেড়ে যাবো না ও ভালো হলে ওকেও নিয়ে যাবো। তারপর কিছুদিন পর সুধা ফিরে আসবে। মা কাকিমারা আমাদের কথা শুনে বলছিলেন, সুধা তো বেড়াতে যেতেই পারে তবে এখন তো ওর অসুখ।

এইসব কথা সুধার কানে পৌঁছেচে। যখন সে একটু ভালো থাকতো জিজ্ঞাসা করতো : রেণুরা চলে গেছে ?

মা বলতেন : না, তুমি ভাল হলে ওরা তোমায় বেড়াতে নিয়ে যাবে তাই অপেক্ষা করছে। ম্লান মুখে সুধা একটু হেসে বলে, 'কবে ভাল হবো মা ?'

—এই তো আর ক'দিন হলেই—বাবার কথা শোনা যায়—এই রান্নাবান্না ছাড়ো তো, সুধার ওষুধপত্রগুলো যেন খাওয়ানো হয়। আমি কিছু সুবিধে বুঝছি না। মার মুখটা মলিন হয়ে যায়।

* * *

জ্বর ছাড়ার আগেই আমাদের চলে আসতে হলো। দাদুর অবস্থা খারাপ হচ্ছে। মা'দেরও সুধার জন্য মন খারাপ, কিন্তু কি হবে—।

চলে আসার দিন রেণু আর আমার কান্না দেখে সুধার মা খুব বিচলিত হয়েছিলেন, অনেক বুঝিয়েছিলেন। সুধা ভাল হলেই কোলকাতাতে নিয়ে আসবেন। সুধা তখন অচৈতন্য হয়েছিল। বিদায় নিয়ে আসার সময় যতক্ষণ দেখা যায় আমরা সুধার বাড়ির দিকে সজল চোখে চেয়েছিলাম। বারান্দায় সুধার মা আর ছোটভাই দাঁড়িয়ে যতদূর দেখা যায় দেখছিলেন।

মা কাকিমা আমাদের চোখে জল দেখে বলছিলেন, অসুখ হলে কাঁদতে নেই। বরং মনে মনে ভগবানকে জানাতে হয়, প্রার্থনা করতে হয় অসুখ যেন ভাল হয়ে যায়।

বাড়ি পৌঁছোতেই সোরগোল—রেণু আর আমায় নিয়ে। ওরে বাবা, তোরা যে কুমড়ো হয়েছিস্? কি খেতিস, পাহাড় ভেঙ্গে ভেঙ্গে? বাড়িতে আর চোর-ডাকাত আসবে না।—এসব শুনে রাগ হতো।

সুধাকে মনে পড়তো, রোজই জানতে চাইতাম মধুপুর থেকে কোনো চিঠি এসেছে কি না। শুনতাম, এসেছে, সুধা সেই রকমই আছে।

স্কুল খুলে গেল আর দাদুও মারা গেলেন। বাড়িতে সে এক ভীষণ পর্ব চললো। রেণুর সঙ্গেও স্কুল ছাড়া দেখা হতো না। যেদিন হতো সেদিন খুব সামান্য কথা হতো। বাড়ির ব্যাপারে আমরাও খুব ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লাম। সুধার কথা ক্রমশঃ আবছা হ'তে লাগলো।

একমাস পরে সব যখন মিটে গেছে, বাড়ির অবস্থা স্বাভাবিক—তখন একদিন রেণুকে বললাম: সুধার খবর নেওয়া হয়নি, কি জানি কেমন আছে?

রেণু বললে : কি ভালো মেয়ে সুধা, আমাদের কি ভালবাসতো, না ? মুখটা এখনও চোখের সামনে জ্বল জ্বল করছে।

আমি বললাম : আমি রাতে সুধাকে স্বপ্ন দেখেছি—জানিস ? সেই খেলা করছি আমরা, সুধা বড্ড রোগা হয়ে গেছে, বলছে, 'তোমরা আমায় ভুলে গেছ, আমি কিন্তু তোমাদের মনে রেখেছি।' আমি কিছু বলবার আগেই ঘুম ভেঙে গেল। কি করে সুধার খবর পাওয়া যায় বলতো ?

—মার কাছে ঠিকানা চাইবো, চিঠি লিখবো।

—দূর আমি বলেছিলাম, আমার মা বললেন, 'ঠিকানা তো জানি না। ঐ যে কী 'কুটীর' যেন নাম ছিল বাড়িটার ? আচ্ছা তোমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করবো।' কিন্তু করেননি। বাবাকে আমিই বললাম কিন্তু বাবা কপাল কুঁচকে একটু ভেবে বললেন, 'চিঠি লিখবে ? লেখো, আমি পাঠিয়ে দেবো।' ব্যস্ ঐ পর্যন্ত।

আবার আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। পরীক্ষা ক্রমে এসে গেল।

আগের মত দিন চলতে লাগলো। সুধাকে মনে পড়তেও তার খবরের জন্য ব্যস্ত হইনি।

এখন আমরা বড় হয়ে গেছি তবু মধুপুরের সুধাকে ভুলিনি। ভোলা যায়নি কিন্তু কোনো খবরই জানি না।

সেই ছোটবেলার সুধা। অল্পদিনের পরিচয়—কিন্তু কেন ভোলা যায় না ?

হয়তো সুধা নেই, তাই ঠিক। বড় হয়ে বুদ্ধি দিয়ে বুঝেছি কিন্তু সুধা আজও এই পরিণত বয়সেও সুধার ভাণ্ডার নিয়ে ভরে আছে মনের মধ্যে।

রেণুও তাই বলে।



কিরে শুধা খেলতে যাবি না?

ধীরে ধীরে ফল ফলে

সেদিন কুমকুমের একেবারে পড়া হয়নি, তার মানে পড়া তৈরী করতে পারেনি। কেমন করেই বা পারবে? একে তো রুণুদের দল এসে যা তাড়া লাগালো খেলতে যাবার জন্য, সেইজন্য ভালো করে খাবার খাওয়াই হলো না। হালুয়া আর পাঁপর-ভাজা খেতে কতটুকুই বা সময় লাগে, কিন্তু তাও খেয়ে উঠতে পারলো না। খাবার জলের গেলাসে পাঁপর-ভাজা ডুবিয়ে যেই না খেতে গেছে, পড়বি তো পড়, একেবারে পিসির চোখে! পিসি একালের আধুনিকা মেয়ে হলে কি হবে, যা রাগী মেয়ে, বাবা! ওকে পড়বার সময় দেখলে আর পড়া হয় না। হবে কেমন করে? বই হাতে দেখলেই বলে বসবে—কই দেখি, কুমকুম, কেমন পড়া হয়েছে? ও-কথা শুনলেই অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে—না পারলেই বকুনি আর ঐ সব শব্দগুলো—যা শুনে-শুনে কুমকুম মুখস্থ বলতে পারে: এ সব মেয়েদের কিছু হবে না। কেবল খেলা, নাচ, গান! কোথায় মিটিং হচ্ছে, স্কুল পালিয়ে চল সেখানে, আজ স্ট্রাইক, কাল এর ছুটি, হেন-তেন, একটা না একটা বুদ্ধি বেরুবেই। বড়দা যেমন কিছু বলে না! দেখবে কেমন মেয়ে হবে……ইত্যাদি ইত্যাদি।

কুমকুম ভাবে পিসি যে অত বলে, তা ওরা কি ছোটবেলায় গঙ্গার ঘাটের সাধুর মত চোখ বুজে বসে থাকতো, না ঠাকুমার মত ঠাকুরঘরে মালা জপ করতো—তা করলে কেমন করে পাস করলো আবার কলেজ থেকে? হঠাৎ কুমকুমের কানে আসে—ওর ছোটদা পিসিকে শুনিয়ে শুনিয়ে ওকে বকুনি খাওয়াবার জন্য যেন পড়ছে: ABC ত্রিভুজের A বিন্দু হইতে BCর মধ্যবিন্দু Dর উপর AD লম্ব টানা হইয়াছে। প্রমাণ করিতে হইবে যে—

কুমকুমের আরো বেশী রাগ হয়, জ্যামিতির ঐ ABC শুনলে তার গায়ে জ্বালা ধরে, ছোটদা জানে বলে বেশী করে অমনি করে। তা ছাড়া গাধার মত চেঁচালে ওখানে পড়া যায় না কি ? এই কথা বলেছিল বলেই তো ছোটদা ওর বেণী ধরে টান মারলো ! এত পাজী ছেলে, আর পিসি বলবে অলকের মত পড়াশুনোয় ভালো ছেলে দেখা যায় না, কুমিটা হচ্ছে ফাঁকিবাজ। একথা শুনলে কার না কান্না পায় ? আবার সুন্দর নামটাকে কাট-ছাঁট করে 'কুমি' বলা হচ্ছে। ছোটদা তো শিখলেই যখন তখন বলবে বন্ধু-বান্ধবদের সামনেই। মাকে বলেও তো ফল হলো না, বললেন : আচ্ছা, সবাই তোমায় কুমু বলবে, রবীন্দ্রনাথ এই নাম তাঁর লেখায় ব্যবহার করেছিলেন। ধুত্তোর রবীন্দ্রনাথ, কুমকুমের ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করে। ওর অমন সুন্দর নামটাকে যা-তা করবে সবাই, অথচ অনুযোগ করলে কেউ আমল দেবে না। সবচেয়ে রাগ তার পিসির উপর, অত যে সাধু সেজে বলা হয়, মিটিং, স্ট্রাইক—যেন নিজেরা কিছুই করেননি—এই সেদিন কুমকুম স্বকর্ণে শুনেছে, পিসির সেই বন্ধু অলকা সেনকে পিসি বলছে : তোর মনে পড়ে অলকা, স্কুল পালিয়ে প্রমীলাদের বাড়ীর ছাদে লুকোচুরি খেলা আর তেঁতুল খাওয়া ? একদিন ছাদের আলসেতে নামা হয়েছিল আর পাশের বাড়ীর গিন্নী কাপড় তুলতে এসে চীৎকার করেছিল আমাদের দিকে চেয়ে ?

অলকা সেনও তো বলছিল : মনে নেই আবার, সেদিন তো শুধু বকুনি নয়, মারও খেতে হয়েছিল।

তবে যে পিসি অমন করে বলে, এবার একদিন কুমকুম স্পষ্ট বলে দেবে, তারপর মার খেতে হয় খাবে।

কিন্তু মুস্কিল তো ঐখানে, আজই রুণুরা এলো, আজই খেলতে যাবার জন্যে পাঁপরগুলো জলে ডুবিয়ে খাওয়া হলো, সবই আজ, আর পিসিই দেখলো—নাঃ, কুমকুম আর ভাবতে পারে না। পড়া ছেড়ে আস্তে-আস্তে শোবার ঘরের ভিতর ঢুকলো। ঘরের পিছন দিক্‌কার



কুমকুম ভারী-মুখে জানলার রেলিং ধরে গাছের দিকে চেয়ে রইল।

জানলাগুলোর কাছে একটা বড় গাছ ছিল, সেই গাছে থাকতো একঘর শালিক। কর্তা, গিন্নী আর বাচ্চাকাচ্চা। কুমকুম অনেক সময় লক্ষ্য করেছে ওরা কি বলাবলি করে, কিন্তু কিছু সে বুঝতে পারে না। আজ যেন কুমকুমের মনে হচ্ছে, ওরাই ওর বন্ধু, বকা-ঝকা করে না, কালো চোখ বার করে, মাঝে মাঝে বাসা ছেড়ে উড়ে এ-ডাল ও-ডাল করে বেড়ায়। খেলাধুলো না থাকলে কুমকুম এইসব দেখে।

গাছটাও মস্ত গাছ, ডালে-পাতায় ভরতি, একটুকু ফাঁক নেই। উপর-তলা নীচ-তলা হয়ে গেছে তিন-চার-তলা বাড়ীর মত। সব উপরের তলায় থাকে এক-ঘর চন্দনা, মাঝের তলার ভারাটে শালিক-পরিবার আর নীচের তলায় চড়াই-গিন্নী ছানা-পানা নিয়ে আরাম করে বাস করে। তাদের খাবার-দাবার কুমকুমদের ভাঁড়ার থেকে যা আসে তাই যথেষ্ট—ইচ্ছা করলে কিছু বিলিয়েও দিতে পারে। কিন্তু যে সুবিধাটা চড়াই-গিন্নী এই রেশনের দিনে পাচ্ছে, তা কিন্তু উপর-তলা বা মাঝের তলার ভাড়াটেরা পায় না। তা না পাক, তাদের খাবার সংগ্রহ করার শক্তি আছে।

এই ঝাঁকড়া-মাথা গাছটার নীচে দাঁড়ানো যায়, বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে নীল আকাশের একটুও দেখা পাবে না। খাটে শুয়ে কুমকুম কত রাত ঘুম ভেঙে ভয় পেয়ে বালিশে মুখ গুঁজে ঘেমে নেয়ে উঠেছে। সারাদিন ধরে দিনের আলোয় যে গাছকে দেখেছে, গভীর রাতে নিস্তব্ধ পৃথিবীতে তার যেন অন্য রূপ দেখে সে আতঙ্কিত হয়েছে।

তবু তিন-তলার তিন-ঘর অধিবাসীদেরই সে চেনে। বেশী ভালো লাগে তার মাঝের তলার বাসিন্দাদের। তাদের বাসার সঙ্গে তাদের ঘর একেবারে এক সমান লাইনে। কুমকুম ভারী-মুখে জানলার রেলিং ধরে গাছের দিকে চেয়ে রইল।

শালিক গিন্নীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল: দেখেছ, বাগচী-বাড়ীর মেয়েটা অভিমানে মুখ ফুলিয়ে রয়েছে।

কর্তা ঘাড় গুঁজে আরাম করছিল, বললে ঃ দেখিছি বৈকি, বেচারার পড়া হয়নি আর ওদের বাড়ীর ছোট ছেলেটা গলা ফাটিয়ে পড়ছে, শুনছো না ?

—শুনছি বৈ কি ! আহা ; একরত্তি দুধের মেয়ে, এত পড়ার চাপ দেওয়াই বা কেন ? ঐ ওর পিসিটা, উঁচু জুতো পরে খট্‌খটিয়ে ছাতা হাতে করে বেরোয়—ওই তো বেশী শাসন করে। শালিক-গিন্নী স্নেহভরে একবার কুমকুমের দিকে তাকালো।

কর্তা বললে ঃ কিন্তু যে বয়সের যা। এখন ছোট কিন্তু একদিন তো বড় হবে, চিরদিন ছোট থাকবে না, লেখা-পড়া তো করতেই হবে।

গিন্নী ঠোঁটটা একবার গাছের ডালে ঘষে নিলো, তারপর বললে ঃ তা তো বটেই—তবে বড় ছেলেমানুষ।

কর্তা বললে ঃ তা আর কি হবে বলো ? একটু একটু করে সব দিক দিয়ে বড় হবার চেষ্টা করা উচিত, আর এখন থেকেই—এই ছোট থেকেই।

গিন্নী আর একবার তাকালো নরম চোখে কুমকুমের দিকে, তারপর বলে উঠলো ঃ আহা, তা হোক, কচি বাচ্চা।

কর্তা রেগে বাধা দিয়ে বললে ঃ কচি বাচ্চা—কচি বাচ্চা করে তুমি তোমার ছেলেমেয়েদেরও মাথা খেয়েছ, বিশেষ করে বড় ছেলেটার।

—কেন কি করেছে সে ?

কর্তার মেজাজ তখনও সমান পর্দায় ঃ হয়েছে আমার মাথা আর তোমার মুণ্ডু !

গিন্নী কিছু বলবার আগেই ছোট ছেলে হাঁপাতে হাঁপাতে তাদের কাছে এসে ডাকলো ঃ মা-বাবা !

গিন্নী ব্যস্ত হয়ে বললে ঃ কি হয়েছে রে, এত হাঁফাচ্ছিস কেন ?

ছোটর সারা মুখটা লাল হয়েছে, হাঁপাতে হাঁপাতে বললে ঃ অনেক—অ-নে-ক দূর উড়ে বেড়িয়ে এলাম। দিদি সঙ্গে ছিল। আকাশটা কোথায় শেষ হয়েছে কেবল তাই দেখতে ইচ্ছে করে।

গিন্নী ছোটর কাছে সরে এসে বললে ঃ ষাট ষাট, অতদূর

যাস নে, বাপু।

কর্তা হুঙ্কার দিয়ে উঠলো : না যাবে না, তোমার কোলের কাছে বসে থাকবে ?

—আচ্ছা, তুমি থামো, তোর দাদা কোথায় রে ছোট ?

আবার কর্তার সপ্তমে-চড়া কণ্ঠ শোনা গেল : কোথায় আবার যাবে, বাসায় পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে, একটুও উড়তে পারে না, পোকা ধরতে পারে না—একেবারে হাঁদা গঙ্গারাম—অমন ছেলে থাকার চেয়ে যাওয়া ভালো।

গিন্নী ঝংকার দিয়ে উঠলো : বলি, বুড়ো বয়সে ভীমরতি হয়েছে নাকি ? ষাট ষাট, বাছা আমার বেঁচে থাক !

—বেঁচে থাকবে কি করে ? শক্তি চাই, বুঝলে গিন্নী ! নির্জীব হয়ে পড়ে থাকলে এ যুগে বাঁচা চলবে না। উড়তে পারবি না, পোকা ধরতে পারবি না, তবে পাখী হয়ে জন্মেছিস কেন ? মানুষের ঘরে জন্মালেই তো পারতিস !

—তা বেচারা পারে না কি হবে ? গিন্নীর কথার সুরে অনুকম্পা।

—পারে না কেন শুনি ? তার ছোট ভাই, ছোট বোন যখন আকাশের শেষ কোথায় দেখবার চেষ্টা করে, পোকা-মাকড় ধরে খায়, তখন ধেড়ে ছেলে বাসায় খেয়ে পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে, আর মা-বাপের হাত-তোলা খাচ্ছে, লজ্জা করে না,—ছিঃ !

—তা কি করবে ? বেচারার ডানায় জোর নেই।

—কে বললে জোর নেই ? ভয়েই সারা, এ যুগে ঐ কুঁড়েমি আর ভয় থাকলে তোমার ছেলে ঐ বাসায় পচে মরবে, বুঝলে ?

গিন্নী রেগে বললে : একশো বার ঐ ছাই কথাগুলো বোলো না বলছি—

ছোট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল, এবার বলে উঠলো : আমারও ঐ রকম ভয় করতো, মনে হতো উড়তে পারবো না, ডানা ভেঙে পড়ে মরবো।

কর্তাও বলে উঠলো : হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছোটবেলায় আমার অমনি হতো,

সকলেরই হয়।

ছোট একদমে বলে চললো : চেষ্টা করতেই দেখলাম বেশ উড়তে পাচ্ছি। আর সে কি মজা আর আনন্দ!

গিন্নী একটু ভেবে বললে : বড়কে একবার চেষ্টা করে দেখতে বললে হয়।

কর্তা বিরক্ত হয়ে বললে : কিন্তু চেষ্টা করে দেখবার কি মন আছে? মন থেকে ভয়কে মুছে ফেলতে না পারলে কোন কালেই কিছু হবে না, শুধু বয়সই বাড়বে, বুদ্ধি আর পাকবে না। শোন গিন্নী, বড়কে ওড়া শেখাতেই হবে, আজ কেউ ওকে খাবার দিতে যেও না।

—বা রে, না খেয়ে থাকবে ছেলেটা? গিন্নীর কণ্ঠস্বর ভিজে।

—না, না, নিজের চেষ্টায় ও খাবার খুঁজে নিক, উড়তে শিখুক। আত্মনির্ভরশীল হওয়া দরকার, শক্তি চাই। কর্তা জোর দিয়ে বলে উঠলো।

ছোট তার দিদির সঙ্গে আবার উড়ে চললো আকাশে। উড়তে উড়তে নীল আকাশের কোন্ অসীম শূন্যে তারা মিলিয়ে গেল ক্রমশঃ।

বাসায় শুয়ে বড় ঝিমুচ্ছিল—সে দেখলো ওরা উড়ে গেল, নীচের তলার চড়াই-গিন্নীর সেদিনের কচিবাচ্চাটা পর্যন্ত তার আহার সংগ্রহের চেষ্টা করছে। উপর-তলা থেকে যে আসতো মাঝে মাঝে, কথা বলতো —চন্দনার সেই ভাইটাও পাখা মেলে উড়ে গেল।

বড় দেখছে একমনে, একমাত্র সেই—বাসায় পড়ে আছে অথর্বের মত।

মা ডাকলো : বড় এসো, খাবার নাও।

বড় এগিয়ে আসার চেষ্টা করলো—কিন্তু পারলো না। মা আবার ডাকলো, বললে : চেষ্টা করো বড়, ঠিক পারবে।

বড় ন'ড়ে-চ'ড়ে উঠলো : না মা, পড়ে যাচ্ছি যে!

একবার পড়বে, দু'বার পড়বে, তিনবারে ঠিক উড়তে পারবে।

বড় প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলো। শালিক-গিন্নী তখন বলছে :

নিজের শক্তি জাগাতে হবে, ওঠো বড়, ঠিক উড়তে পারবে।

কুমকুম তখন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

মনে হলো, তাদের সব কথা সে বুঝতে পেরেছে। ভারী আরাম আর আনন্দ হচ্ছিল তার। মনে হলো, সে-ও যদি ডানা মেলে অসীম শূন্যে উড়তে পারতো।

শালিক-গিন্নীর বড় ছেলে মাটিতে পড়ে গেছে, উড়তে চেষ্টা করেছিল পারেনি।

মা এসে ছেলের মুখে খাবার দিয়ে বললে : ঠিক উড়তে পারবে বড় চেষ্টা করো, চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই। মনে রেখো, নিজের শক্তি জাগাতে হবে।

পিসির কণ্ঠ শোনা গেল : কুমকুম কই রে ? পড়তে বসেনি ?

ছোটদার উচ্চকণ্ঠ তখনও ঘোষণা করছে : ABC ত্রিভুজের A বিন্দু হইতে BC-র মধ্যবিন্দু D-র উপর লম্ব টানা হইয়াছে—

কুমকুম আর একবার নীল আকাশের দিকে চাইলো—দেখলো, শালিক-গিন্নীর বড় ছেলে উড়ে চলেছে……।

কুমকুমের কানে বাজতে লাগলো : মনে রেখো, নিজের শক্তি জাগাতে হবে……।

ঠাকুর্দা

নিতু হবার পরই মা মারা গেলেন—আর তার কিছুদিন পরে বাবা। ব্যস্, দেখবার লোক নেই। নিতু তো খুব ছোট্ট, ওর ক্ষুদে গিন্নী দিদি ইতু তখন পাকা পাঁচ বছরের। ভাবনাটা তাকেই ভাবতে হবে, কিন্তু সে বুঝতেই পারছিল না ব্যাপারটা কি হলো। ফুলের মত সুন্দর মা—একটা ছোট্ট হাত-পা-ওয়ালা পুতুলের মত ভাইকে উপহার দিয়ে সেই যে ঘুম-ঘুম চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে চুপ করলেন—আর কথা বললেন না। সকালে উঠে ইতু মাকে আর দেখতেই পেলো না। বাবা কোলে নিয়ে চুমা দিয়ে ছল ছল চোখে বললেন ঃ ঐ যে মস্ত আকাশ দেখছো ইতু, তোমার মা ঐখানে, রাতে যে সবচেয়ে বড় আর জ্বলজ্বলে তারাটা দেখতে পাবে সেইটি তোমার মা।

—বাড়ীতে মা আর আসবে না বাবা ?

—তোমরা যখন বড় হয়ে উঠবে, মা তখন ফিরে আসবেন।

—তা'হলে আমাদের খেতে দেবে কে ? কোলে নিয়ে আদর করবে কে ? ঐ পুতুলটাকে নিয়ে খেলবে কে ?

—সব আমি ক'রে দেবো মা-মনি,—যাও খেলগে।

ইতু কিছুই বোঝে না, কেমন যেন খালি-খালি মনে হয়, মায়ের কাপড়গুলো তখনও আলনায় সাজানো, ড্রেসিং-টেবিলে মায়ের চুলের রূপোর কাঁটাগুলো, সিল্কের ফিতে, সিঁদুর-কৌটো, চিরুনী সব পড়ে আছে। শোবার ঘরে খাটে মায়ের জায়গা খালি—কেমন যেন ফাঁকা আর বিচ্ছিরি লাগে ইতুর। সন্ধ্যা হলেই তার ঘুম পায় কিন্তু মায়ের গরম কোলে শুয়ে পড়াও যায় না, মাথায় হাত বুলিয়েও কেউ

দেয় না। বাবা খাটে শুইয়ে দিয়ে কাছে বসে থাকে। পাশের ছোট্ট খাটখানায়—মায়ের শেষ উপহার পুতুলটি অঘোরে ঘুমোয়, কখনও কখনও চেঁচায়, বাবা ঝিকে ডেকে কাপড়-জামা বদলিয়ে দিতে বলেন। ইতু রোজ মনে করে আকাশ ভ'রে তারা উঠলেই বড় জ্বলজ্বলে তারাটাকে সে ডেকে বলবে : "শীগ্গির এসো, রাতে ভয় করে আমার, খেয়ে পেট ভরে না—সব কেমন বিচ্ছিরি হয়ে গেছে।" কিন্তু তারা উঠবার আগেই সে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম ভেঙ্গে দেখে সূর্যিমামার আলোয় ঘর ভ'রে গেছে। ইতুর ভারী দুঃখ হয়। বড় তারাটাকে কিছুতেই সে আর দেখতে পায় না।

এমনি করে কিছুদিন কেটে গেল। নিতু এখন বড় হয়েছে, বসতে শিখেছে, হাসে, খেলে। দিদিকে সে খুব চিনেছে, দিদি যখন তাকে অনভ্যস্ত হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে, সে দিদির নাকটা মাড়ী আর জিব দিয়ে চেপে ধরে, হাসে। বাবা কোলে নিতে চাইলেও যায় না। মায়ের পুরনো ঝি, সে নাকি মার বাবার বাড়ী থেকে এসেছিল—সেই 'মাসী' ইতু আর নিতুকে দেখাশোনা করতো, খু-উ-ব ভালোবাসতো।

নিতু সবে হাঁটতে শিখেছে—সেই সময় একদিন দু'-তিনদিনের অসুখে বাবাও চলে গেলেন। ইতু ভেবে পায় না বাবা আবার কোথায় গেল। লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদে ইতুরও একদিন জ্বর এসে গেল। মাসী ইতুর কথা বুঝতে পারে, বলে : তোমরা বড় হ'লেই বাবা, মা দু'জনেই ফিরে আসবে। ইতু কি বোঝে সেই জানে, তবে ভাইকে সে খুব ভালোবাসে, মাসীকেও।

বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। ইতু আর নিতু দু'জনেই এখন স্কুলে যায়। কিন্তু হলে কি হবে—এর মধ্যে কিছুদিন ধ'রে একটা লোক তাদের বাড়ী আনাগোনা করতো, মাসীকে খুব শাসাতো—কি সব বলতো ইতু বুঝতে পারতো না—মাসী বলতো আমি ওসব কখনও পারবো না। লোকটা মাসীকে ধমকাতো, বকতো, তারপর চ'লে যেতো।

মাসীর কাছে ইতু শুনেছিল, ও নাকি কাকা হয় ইতুদের। বাবা থাকতে কিন্তু ইতু ঐ লোকটাকে দেখেনি। তাই ইতু লোকটাকে দেখতে পারে না। সে এলেই ও নিতুকে নিয়ে অন্য ঘরে চলে যায়। কিন্তু ইতু দেখতে পায় ক্রমশঃ তাদের বাড়ীর ভালো ভালো জিনিষ-গুলো সব সেই লোকটা নিয়ে যাচ্ছে। বাবার চমৎকার মোটরটাই সে একদিন নিয়ে চ'লে গেল। বাড়ীর কত ভালো জিনিষ একটা একটা ক'রে চলে যাচ্ছে, সবই তার বাবা-মা'র জিনিষ। মাসীকে বললে মাসী কাঁদে আর তাদের বুকে চেপে ধ'রে আদর করে। মাসীর কান্না দেখে ইতু আর কিছু বলে না। শোবার ঘরের পাশের ঘরে যে প্রকাণ্ড বড় ঘড়িটা আছে—লম্বায় প্রায় ইতুর তিন ডবল—কি মিষ্টি আওয়াজ ক'রে সময় দেয়। সেই ঘড়িটার জন্য ইতুর ভারি ভাবনা হয়—সে ভাবে যদি এটা সেই লোকটা নিয়ে যায়—এটাকে সে কিছুতেই দেবে না, ইতুর বেশ মনে আছে—বাবা বলতেন : বুঝলে ইতুমণি, এটা হচ্ছে লক্ষ্মী ঘড়ি, আমার ঠাকুর্দা আমায় দিয়েছিলেন—আমি তখন তোমার চেয়ে আর একটু বড়, আমার ঠাকুর্দা খুব বড়লোক ছিলেন আর আমায় খুব ভালোবাসতেন। আমি তাই এই ঘড়িটাকে 'ঠাকুর্দা' বলি।

—আচ্ছা বাপি, তোমার ঠাকুর্দা তোমায় গল্প বলতে পারে না? ইতু বলতো।

—খু—উ—ব খুব, ওর কি মিষ্টি আওয়াজ বলতো, ঐতেই তো ও কত কথা বলে দেয়।

—ও তোমায় খুব ভালোবাসে বাপি?

—খুব, তোমাকেও বাসে, ঠাকুর্দা কি না।

—অত বড় কেন বাপি? কি লম্বা, আমার দেখলে মনে হয়—লোক দাঁড়িয়ে আছে।

—ঐ যে বললুম—ঠাকুর্দা বড় তো হবেই।

বাবার এইসব কথা ইতুর খুব মনে হয়। রাতে শুয়ে ভাইকে বলে : বুঝলি নিতু, এই ঠাকুর্দা আমাদের খুব ভালোবাসে, বাবা বলতো

ঠাকুর্দা গল্প বলতে পারে, আর সব কথা বলে দিতে পারে।

—তোর চেয়ে, মাসীর চেয়েও ঠাকুর্দা ভালো দিহু ?

—হ্যাঁরে, ও-যে অনেক বড়।

এমনি ক'রে ছোট্ট ভাই আর বোনের দিন কাটে। নিতু রোজ একবার ক'রে সেই বড় আর সোনার মত হাত-পা-ওয়ালা ঘড়ির কাছে যায়, কেউ না থাকলে চেয়ার দিয়ে ওঠে, তার গায়ে হাত দিয়ে বলে ঃ বুঝলে দাহু, আজ কি হয়েছে ?……দিনের সব খবর নিতু ঘড়ির কাছে গিয়ে ব'লে আসে। ইতু মাঝে মাঝে দেখতে পায় কিন্তু তারও বিশ্বাস ঠাকুর্দা থাকলে ঐ লোকটা বা অন্য কিছুর ভয় নেই।

আবার একদিন লোকটা এসে নিতুর ছোট গাড়ীটা আর বাবার ভালো ভালো জিনিষ নিয়ে গেল। ইতুর ভারি দুঃখ হচ্ছিল—নিতুকে সে কি বলবে ?

মাসীও খুব কাঁদছে। লোকটি চ'লে যেতেই নিতু ছুটতে ছুটতে এসে মাসীর গলা জড়িয়ে ধরলো ঃ আবার সেই লোকটি এসেছিল মাসী, তুমি ওকে মেরে তাড়িয়ে দাও না কেন, ওকে দেখলে আমার এত ভয় করে কি বলবো, একি তুমি কাঁদছো কেন মাসী ? কি হয়েছে রে দিহু ?

—নিতু লক্ষীছেলে ভাই, তুমি দুঃখ করো না, তোমার গাড়ীটা নিয়ে গেছে ঐ লোকটা, ওর না কি তোমার মত একটা ছেলে আছে।

—ইস্, কেন নেবে ? মেরে হাড় ভেঙ্গে দেবো না ?

—অমন বলতে নেই ভাই, তুমি বড় হ'লে আবার নতুন গাড়ী কিনে আনবো, মাসী বলেছে। ইতু বলে।

নিতু একটু চুপ ক'রে থেকে ছুটে চ'লে যায় ঘড়িটার কাছে, বলে ঃ জানো দাহু, আমার গাড়ীটা নিয়ে চলে গেছে, তুমি ওকে কিছু বলবে না ?

নিতুর কথা শেষ হতেই টিং টিং ক'রে ঘড়িটা বেজে উঠে সময় দেয়। নিতু ভাবে দাহু তা'হলে সব শুনেছে, নিশ্চয়ই তা'হলে গাড়ীটা দাহু

এনে দেবে।

রাতে শোবার সময় নিতু চেয়ার দিয়ে উঠে ঘড়িটার গায়ে হাত দিয়ে বললে ঃ ভুলে যেও না যেন, বুঝলে দাদু ? গাড়িটা আমার চাই।

নিতু দেখে ঘড়ির কাঁটা দুটো যেন চিক্‌চিক্ করে উঠলো। নিতু ভাবে দাদু তা'হলে সব কথাই শুনেছে।

এক এক করে ইতুদের সব জিনিষই চলে গেল। মাসী কোনো ব্যবস্থাই করতে পারে না, খুব ঝগড়া করে লোকটার সঙ্গে, পাড়ার লোকদের বলে—কিন্তু তারা কি করবে, তারা তো পাড়ার লোক—আর এ হচ্ছে সম্পর্কে কাকা। তবু সকলেই খুব দুঃখ পায় ইতু আর নিতুর জন্য, আহা কত বড়লোকের ছেলেমেয়ে !

স্কুল থেকে এসে নিতু দেখে টম নেই, তার অত সাধের লোম-ওয়ালা সাদা কুকুর টম। নিতু বই-পত্তর ফেলে কাঁদো কাঁদো হয়ে উপরে উঠে ঘড়িটার কাছে গেল ঃ তুমি এখনও কিছু বলবে না দাদু ?···বলতে বলতে নিতু ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললে।

মাসী খাবার দিতে এসে দেখে ঘড়ির নীচে মাথা রেখে নিতু ফোঁপাচ্ছে। আর ঘড়িটা ধীরে ধীরে টিক্ টিক্ শব্দ করে যাচ্ছে, ঘরটি নিস্তব্ধ।

কিছুক্ষণ পরে মাসী নিতুকে ডাকে ঃ চলো লক্ষ্মী, খাবে চলো, তোমার দাদু আমায় বলেছে নিতু বড় হ'লে সব এনে দেবো।

—দাদু বলেছে ? কবে ? নিতু লাফিয়ে ওঠে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ বলেছে, তোমাকেও বলবে বলেছে। সেদিন রাতে খেতে যাবার আগে নিতু আগে উপরে এসে ঘড়িটার কাছে গিয়ে বলে ঃ দাদু, লক্ষ্মীসোনা ভাই, ঐ দুষ্টু লোকটাকে একটু বকুনি দিয়ে দিয়ো—। আজ আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে, তোমায় তো সব বলা হলো না, তোমার উপর রাগও হচ্ছে, কই তুমি তো একদিনও গল্প বলো না—। নিতু হাই তুলে চেয়ারটা ছেড়ে বিছানায় চলে গেল।······

নিতু অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে দেখছে, ভাবছে দাদুর সঙ্গে আর

কথা কইবে না—কিন্তু ও কি? ঘড়িটার বড় কাঁটা হু'টো যেন হু'খানা হয়ে গেছে···ওমা! ধবধবে সাদা পোষাক-পরা দাড়িওয়ালা একটা লোক নেমে আসছে দেখো—দিদি, দিদি কোথায় গেল—? কি সুন্দর চেহারা!

লোকটি ধীরে ধীরে নিতুর মাথায় হাত দিয়ে ডাকলো: নিতু!

—কে তুমি? তোমায় তো চিনি না। ভয়ে ভয়ে নিতু উত্তরদেয়।

—বারে, রোজ তুমি আমার সঙ্গে কত কথা বলো—আর এখন বলছো চেনো না? আমি—

—ওহো: তুমি বুঝি দাহু?

—হ্যাঁ ভাই।

—আচ্ছা দাহু, তুমি তো আমার একটা কথারও জবাব দাও না; কেন? আমার ভীষণ রাগ হয়।

—বারে, আমি তো তোমার কথার জবাব দিই, তুমিই শুনতে পাও না তাই বলো।

—তবে তুমি ঐ লোকটাকে ব'কে দাও না কেন?

দাহু নিরুত্তর।

—বলবে না বুঝি? আচ্ছা বেশ না বলোগে, আমি আর কিছু বলবো না।

হু'জনেই চুপচাপ। একটু পরে নিতু বলে উঠলো: আচ্ছা দাহু, তুমি গল্প জানো? মজার গল্প?

—হ্যাঁ, জানি বৈকি!

—বলো না দাহুভাই!

দাহুর মুখের গল্প শুনতে শুনতে নিতু সব ভুলে গেল।

সকালে চোখ মুছে নিতু বলছে: জানিস দিদি—

—কি রে? ইতু বলে।

—না থাক, পরে শুনিস্। দাহুকে জিজ্ঞাসা করে বলবো। আমি একটা নতুন মজার গল্প শুনেছি।

নিতু বেশীক্ষণ লুকিয়ে রাখতে পারে না, সব বলে ফেলে।

—দূর, ও সব স্বপ্ন।

—কখনও না, আমি জানি—।

—আচ্ছা বেশ বেশ, ইতু বাধা দিয়ে বলে ওঠে।

কিন্তু স্বপ্ন বা সত্যি যাই হোক—নিতু নিয়ম-মত রোজই দাদুর কাছে সব বলতো মাঝে মাঝে সে যেন দাদুকে দেখতেও পেতো। সত্যি বা মিথ্যে যাই হোক।

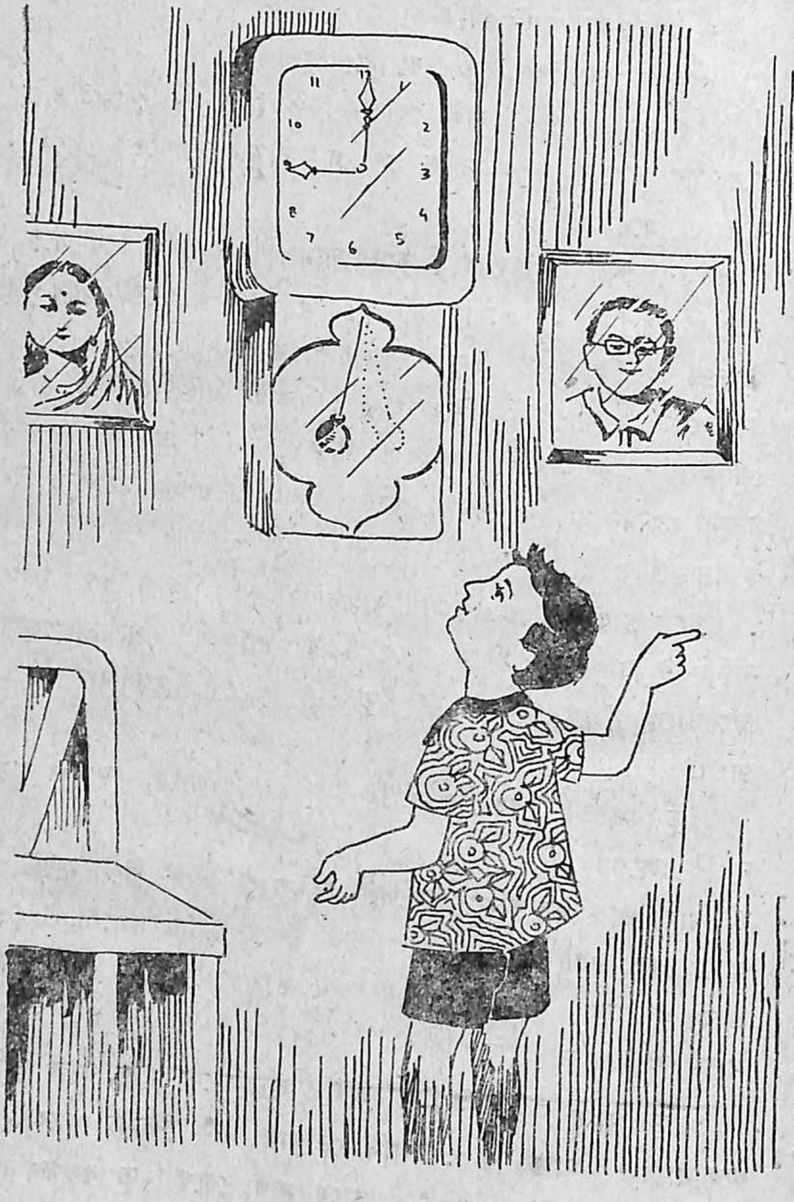
আর অবশিষ্ট কিছুই নেই, নিতুদের জামা-কাপড় পর্যন্ত কমে গেছে। ভাল খাবার দিতে না পারায় মাসী রোজ কাঁদে আর সেই লোকটার উদ্দেশে কত কি বলে। ইতু ভাবে এবার কি হবে? নিতু ভাবে সব যাক, যেন ঠাকুর্দাকে না নিয়ে যায়। একদিন ঘড়িটার দিকে চেয়ে লোকটা বলছিল—বাঃ! চমৎকার ঘড়ি তো। নিতুর দৃঢ় বিশ্বাস ঠাকুর্দা একদিন সব ঠিক ক'রে দেবে। ভাল খাওয়া আর ভাল জামা-কাপড় নাই বা হলো।

রাতে শুয়ে নিতু শুনলো মাসী বলছে দিদিকে: কি যে হবে, কাল নাকি ঐ ঘড়িটাকে নিয়ে যাবে, মিস্ত্রী ডাকিয়ে। ঘড়িটা গেলে ছেলেটাকে বাঁচানো যাবে না ইতু—কি করবো, ভগবানকে এত ডাকছি।

ইতু কিছুতেই উত্তর দেয় না, কি-ই বা দেবার আছে, ভেবেও পায় না কি বলবে।

মাসী আর দিদু ঘুমিয়ে পড়লো। নিতু পা টিপে টিপে ঘড়িটার কাছে গেল, একটা চেয়ার এনে তার উপরে উঠতে লাগলো, উঃ কি ভীষণ অন্ধকার! তবু মনে সাহস এনে ভাবলে: আমি তো পুরুষ-মানুষ, আমার আবার ভয় কি?

ঘড়ির গায়ে হাত দিয়ে নিতু বললে: শুনলে তো দাদু, কাল তুমি চলে যাবে? আচ্ছা যাও, আমি তোমায় আর কিচ্ছু বলবো না, আজ শেষ এসেছি। ঘড়িটার গায়ে মাথা রেখে নিতু কিছুক্ষণ চুপ



শুনলে তো দাদু, কাল তুমি চলে যাবে!?

ক'রে রইল। অন্ধকারে ঘড়ির বড় কাঁটা তুটো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এত উজ্জ্বল—টিক্ টিক্ করে আওয়াজ হচ্ছে—কি মিষ্টি যে লাগে নিতুর।

রাত বোধহয় অনেক হয়ে গেছে, নিতু এবার উঠলো, চেয়ারে সটান হ'য়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঘড়ির দরজাটা খুলে দেখতে লাগলো, এত মিষ্টি আওয়াজ কেমন করে হয়? মনে হলো ঠাকুর্দা বলছে: নিতু ভাই, মন খারাপ করো না। তোমাদের আমি খুব ভালবাসি। নিতু তৎক্ষণাৎ ঠোঁট ফুলিয়ে উত্তর দেয়ঃ তাই তো, কাল তো চলে যাবে? ঠাকুর্দা বলছেঃ পাগল, তোমাদের ছেড়ে কোথায় যাবো?

—হ্যাঁ, মাসী তো দিতুকে বলছিল আমি শুনেছি।

—আচ্ছা শোনো, সত্যি আমি যাবো না। গল্প শুনবে নিতু?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—ব্যস্, নিতুর রাগ জল হয়ে গেছে।

ঠাকুর্দা তখন গল্প বলতে শুরু করেছেঃ তারপর সেই রাজপুত্তুর চলেছে রাক্ষসকে মারতে, অনাহার পরিশ্রমকে তুচ্ছ করে ছোট্ট ছেলে পক্ষীরাজকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে।...এত কষ্ট করতে পারো নিতু?

তারপর দাতু, তারপর?

তারপর? তারপর দাতু বলতে স্থুরু করলো...

—ভীষণ ঘুম পাচ্ছে দাতু, কিন্তু তুমি কাল যাবে না ঠিক তো?

—আচ্ছা নিতু, আমার ডানদিকের পকেটে হাত দিতে পারো?

—তুমি যা লম্বা, তাহ'লে চেয়ার দিয়ে ছুঁতে হয়—

—তুমি পার কি না তাই বলো না, ডানদিকের পকেটে—

—নিতু! নিতু!! মাসীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

নিতু পাশের ঘরে চেয়ারের উপর শুয়ে ঘড়ির গায়ে মাথা ঠেকিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে।...

—দিদি! দাতু বলছে আমার ডানদিকের পকেটে হাত দিতে পারো?

—সে আবার কি নিতু, তোর এমন সব কথা।

—হ্যাঁ দিদি সত্যি, আচ্ছা আয় আমার সঙ্গে—।

নিতু একটা ছোট চৌকির উপর চেয়ার দিয়ে উঠলো ঃ বাঃ! এবার তো ঠাকুর্দার গায়ে হাত গেছে। ধীরে ধীরে নিতু দরজাটা খুলে ডানদিকের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল—ঠিক সেই সময় ঢং ঢং করে আটটা বাজলো আর ঘড়ির কাঁটাগুলো যেন অস্বাভাবিক ভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

নিতুর হাতে অনেক কাগজ-পত্র, আর কিছু নেই। ইতু অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

—সকালবেলা খাবার না খেয়ে কি হচ্ছে সব? এসো ইতু, নিতু—খাবে এসো। মাসী এসে ডাক দিলো। নিতু তখন কাগজগুলো হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনেই নিরুত্তর।

—কি হয়েছে? ইতু?

—এগুলো ঠাকুর্দা দিয়েছে মাসী! নিতু হাত বাড়িয়ে মাসীকে দিলো।

ইতু আর নিতু এখন অনেক বড় হয়ে গেছে, তোমাদের মত। ঠাকুর্দা যে কাগজগুলো দিয়েছিল তা তাদের ঠাকুর্দার সম্পত্তির উইল ইত্যাদি।

সেই বিচ্ছিরী লোকটা যা নিয়ে গিয়েছিল কড়ায় গণ্ডায় তাকে তা ফেরৎ দিতে হয়েছে। ওদের আর কোন কষ্ট নেই। নিতুর সবচেয়ে আনন্দ তার গাড়ী আর টম ফিরে এসেছে। গাড়ীটায় নিতু আর চড়ে না—বড় হয়ে গেছে কি না, কিন্তু টমকে নিয়ে রোজ বেড়াতে যায়। ঠাকুর্দাকে সে আজও ভোলেনি। এখনও রোজ শোবার সময় একবার ক'রে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে আসে।

রাজার অসুখ

এক যে ছিল রাজা—রাজার মতই রাজা। হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, অগাধ ঐশ্বর্য্য, লোকজন, সেপাই বরকন্দাজ, মন্ত্রী, সেনাপতি একেবারে গমগমে ব্যাপার। যাকে বলে, রাজার মত রাজা।

এমন যে রাজা, সুখ-ঐশ্বর্য্যের অন্ত নেই, শুধু রাজার কেন—রাজ্যের কারুরই কষ্ট নেই, সবাই সুখী। সবাই-এর মুখে হাসি—কিন্তু হলে কি হয়, রাজার অসুখ—সে অসুখ কিছুতেই সারে না।

হঠাৎ সেদিন এক কাণ্ড ঘটলো। রাজসভায় রাজা বসে আছেন—পাত্র মিত্র নিয়ে রাজকর্ম পুরোদমে চলছে—কিন্তু রাজার দিকে তাকালেই মনে হয়, রাজা অসুস্থ! রাত জাগার গ্লানি সারা মুখে, চোখের কোলে মোটা হয়ে কালি পড়েছে—কেমন যেন অবসন্ন ভাব সারা শরীরে—তবু রাজা কাজ করেন। রাজার কাজ তো আর সহজ কাজ নয়! এমন সময় রাজার সান্ত্রী এসে খবর দিলো—একটি ছোট মেয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করবে, তাকে এখন আসতে বারণ করা হচ্ছে তবু—সে শুনবে না, বলছে : আমার খুব দরকার—আমি রাজার অসুখ ভালো করে দেবো।

রাজা একটু ভেবে বল্লেন : আচ্ছা নিয়ে এসো তাকে!

সভাসদরা বল্লেন : আপনি ওসব শুনবেন না মহারাজ, বাচ্চা মেয়ে সে আবার কি অসুখ ভালো করবে? এত ডাক্তার বদ্যি হেরে গেল।...

তাঁদের কথা হবার মধ্যেই সান্ত্রীর সঙ্গে একটা সুন্দর ফুট ফুটে মেয়ে রাজসভায় ঢুকলো। সাদা পোষাকে তাকে আরো সুন্দর দেখাচ্ছে কালো কোঁকড়ানো চুলগুলো মুখের এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে, বড় বড় কালো টানা চোখে কি আনন্দ মাখা! মিষ্টি গলায়

বল্লে : তুমি—তো রাজা! নমস্কার! আচ্ছা দেখো এরা আমায় কিছুতেই ঢুকতে দেবে না কেন? আমি তোমার অসুখ সারাতে এসেছি।

রাজা বল্লেন: আমি কাজ করছি বলে তোমার ঢুকতে দেয় নি। এখন তো এসেছো, আর বলছো অসুখ সারাতে এসেছো—কিন্তু জানো, কত বড় বড় ডাক্তার বদ্যি হার মেনেছে? অসুখ সারাতে পারে নি, তুমি তো ছোট্ট খুকু! তুমি আবার কি অসুখ সারাবে?

—হলেই বা ছোট্ট খুকু, আমি অসুখ সারাবো—তাই নিয়ে কথা। বড় আর ছোটতে কি এসে যায়?

—কিন্তু কার কাছে ওষুধ শিখেছো বলতো? তোমার মা কিছু টোটকা ওষুধের কথা বলেছেন তাই নিয়ে এসেছো?

—মা কেন বলবেন—আমি নিজেই জানি।

রাজা আর সভার লোকেরা হো হো করে হেসে উঠলেন আর বল্লেন: বলে কি, একটা বাচ্চা মেয়ে সে নিজেই জানে ওষুধ!

মেয়েটি বল্লে: করেই দেখো না যা বলি। অনেক ওষুধপত্র তো করেছো।

রাজা আবার শব্দ করে হেসে উঠলেন। জানো কত বড় বড় ডাক্তারের ওষুধে কাজ হয়নি আর তোমার মার শেখানো মত অনেক টোটকা ওষুধও হয়েছে কিচ্ছু হয়নি। বেশী কথা বলো না, মার কাছে গিয়ে বলগে 'ওসব হবে না।'

মেয়েটাও নাছোড়বান্দা, কেবলই কথা বলে যাচ্ছে, আর বলছে এ ওষুধ সে নিজে জানে—মা তাকে কিছু বলে নি।

কথা ক্রমশ: বেড়ে যেতে লাগলো—রাজা রেগে উঠে বল্লেন: কে আছো, মেয়েটাকে নিয়ে যাও, হাত পা বেঁধে ঘরে বন্দী করে রাখো।

মেয়েটি এ কথায় কিন্তু ভয় পেলো, বল্লে: তুমি আমার কথা শোনো রাজা, ওষুধ নিয়ে দেখো।

কিন্তু রাজার আদেশ পাওয়া মাত্র আর কেউ অপেক্ষা করলো না,

মেয়েটিকে নিয়ে হাত-পা বেঁধে একটা ঘরে বন্ধ করে রেখে এলো।

সারাদিন কেটে গেল—সন্ধ্যাও গেল। সব কাজের মধ্যে মধ্যে রাজার এক একবার মনে হচ্ছিল মেয়েটির কথা, কিন্তু একটা ছোট্ট মেয়ে তার কথার মূল্য দেবার মত সময় আর মন কোনটাই নেই তাঁর।

কিন্তু রাত্রে যখন শোবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন রাজা, তখন হঠাৎ মেয়েটির কথা মনে হলো। কৌতূহল হলো কি করছে মেয়েটি জানতে। রাজার তো রাতে ঘুম হয়না—তাই যে ঘরে মেয়েটিকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল সেখানে গিয়ে বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে চেষ্টা করলেন।

রাজা দেখলেন মেয়েটি সবে মাত্র মাটি থেকে উঠে দাঁড়ালো। তারপর একটানে হাত-পায়ের বাঁধনগুলো খুলে ফেললো। তারপর জামা কাপড় ঠিক করে নিয়ে পাশের স্নানের ঘরে ঢুকে হাত মুখে জল দিয়ে এলো, তারপর চুল আঁচড়ে, কাপড় বদলে সে মাটিতে বসে পড়লো হাঁটু মুড়ে। তার সামনে খোলা জানলা। ঝির ঝির করে বাতাস আসছে, মেয়েটির কোঁকড়া চুলগুলো বাতাসে উড়ছে, খোলা জানলা দিয়ে চাঁদের আলোয় ঘরটি ভরে গেছে। তেমনি হাঁটু মুড়ে বসে, হাতজোড় করে চোখ বুঁজে মেয়েটি কপালে হাত ঠেকালো। তারপর তেমনি করে অনেকক্ষণ রইলো, মনে মনে হয়তো কি বললো। কপালে হাত তুলে প্রণাম জানালো। কিছুক্ষণ জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আকাশের আলোর দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। আরো কিছুক্ষণ পরে সে অগাধে ঘুমিয়ে পড়লো।

রাজা তো অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন। তারপর ঘুমন্ত মেয়েটির দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে ফিরে এলেন নিজের শোবার ঘরে। ঠিক তেমনি করে স্নানের ঘরে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে, তাঁর ঘরের খোলা জানলার সামনে হাঁটুমুড়ে হাতজোড় করে বসলেন।···তারপর আর কিছু বুঝতে পারলেন না।

সকালবেলা রাজার চাকর এসে দেখে রাজা তাঁর পালংকে শুয়ে



হাত জোড় করে—

অগাধে ঘুমোচ্ছেন। এ রকম আশ্চর্য্য ব্যাপার সে বহুকাল দেখেনি—রাণীমাকে ডাকলো। রাণীমাও আশ্চর্য্য হলেন আবার খুশীও হলেন।

রাজার যখন ঘুম ভাঙ্গলো—তখন তাঁর শরীর বেশ ঝরঝরে, মনটাও বেশ প্রসন্ন লাগছে। সেদিন যথারীতি নিজের ও সভার কাজকর্ম সেরে তিনি সেই ছোট্ট মেয়েটির খবর আনতে লোক পাঠালেন। লোক ফিরে এসে খবর দিল, যে ঘরে মেয়েটিকে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল—সে ঘরে কেউ নেই, দরজা খোলা।

এ কেমন করে হয়? বাইরে থেকে দরজা বন্ধ ছিল, সে দরজা কেমন করে খুলে গেল—কে খুললে? রাজা জিজ্ঞাসা করলেন।

কিন্তু কেউ কিছুই বলতে পারলে না। অনেক খোঁজ খবর করেও মেয়েটির সন্ধান কেউ করতে পারলে না।

সেদিন রাতে শুতে যাবার আগে রাজা আগের দিনের মত সব করলেন। চোখ বুজে, হাত জোড় করে রাজা যখন মনে মনে প্রার্থনা করছেন—মনে হলো, সেই ফুটফুটে ছোট্ট মেয়েটি যেন কাছে এসে বলছে: রাজা! প্রার্থনা কর, প্রার্থনায় সব আছে। কাজ সবই তুমি করো কিন্তু কোনদিন ভুলেও তুমি প্রার্থনা করো না। দিনান্তে যখন হোক একবার সব মানুষের প্রার্থনার দরকার।...তুমি অনেক কাজের লোক—কিন্তু তা হ'লেও সব কাজের আগে কি শেষে যখন হোক একবার সব মানুষেরই প্রার্থনার দরকার। আমি বলেছিলাম তোমার অসুখ সারাবো, বিশ্বাস করো নি; মেয়েটি মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো।

প্রার্থনা শেষ করে রাজা উঠলেন—চারিদিক তাকিয়ে দেখলেন, কোনোদিকে মেয়েটির চিহ্নমাত্র নেই।

রাজা হাত তুলে প্রণাম জানালেন।

রাজার অসুখ সেরে গেছে।

যদি তোমরা কোনদিন রাজার শোবার সময় যাও—দেখবে সারা দিনের কাজকর্ম সেরে তিনি নিয়মিত প্রার্থনা করে তারপরে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েন—আর গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যান।

মেয়েটি বলেছিল: প্রার্থনা করা প্রত্যেকের জীবনে দরকার এবং মনে রাখা উচিৎ।

রাজা সে কথাটা কোনও দিন আর ভোলেন নি।

বাদশা বেগম

বাদশা আর বেগম।

কে এরা ? কে আবার ! রাজা রাণী না হয়ে বাদশা আর বেগম হয়েছে। হবে নাই বা কেন বলো—এসব হচ্ছে উদভুট্টি শখ আর অদ্ভুত খেয়াল।

কার ? কার আবার। অনেকের। হ্যাঁ তারই বিচিত্র খেয়ালের জন্য বাদশা আর বেগম এলো সেই অনেক দূর থেকে—পাথরবেড়ে বলে একটা গ্রাম থেকে।

—আহা বলছি, বলছি—বাদশা বেগম গ্রাম থেকে এলো কেন ? কেন রাজপ্রাসাদ থেকে এলো না ?

চুপ করে শোন—কেমন করে রাজপ্রাসাদ থেকে আসবে বলো ? অত বাচ্চা পোকামাকড় খেকোদের কেউ জায়গা দেয় নাকি রাজপ্রাসাদে ? কাজেই অলকদের ঝি যামিনী যখন দেশে গেলো তখন ছোটদাদাবাবুর খেয়াল মেটাতে ছোট্ট চুপড়ি করে ঢাকাঢুকি দিয়ে রেলে করে ঝির কোলে চড়ে তারা এলো প্রাসাদেও নয়, ছোট্ট কুঁড়েঘরেও নয় —এলো অলকদের ফ্ল্যাটবাড়িতে।

—কিঁউ - কিঁউ—কিঁউ—ডাক শুনে অলক ব্যথা পা নিয়ে ছুটলো—যামিনীদি, যা বলেছিলাম ?

—থাম গো দা'বাবু, আমায় সবুর করতে দাও—মা কই গো, মা—।

—আরে মা, মা এখন রান্নাঘরে। কি এনেছো বল না আগে, ওসব পৌটলা-পুঁটলিতে কি আছে ?

—ওসব মার ফরমাসী জিনিস—মা কই ?

ব্যথা পা টান করে রেলিং-এ ভর দিয়ে অলক বেশ জোরে বলে

উঠলো : আছে আছে, বাবাঃ বলছি থামো।

—কি হচ্ছে অলক? যার আর্বিভাবের সংগে সংগে অলকের গলার সুর নেমে গেল।

—দেখ না মা, যামিনী দি— অলক ঢোঁক গিলছে, যামিনীর বিরুদ্ধে কিছুই বলবার নেই তার। তবে?

মা বললেন : সব বুঝেছি এখন যাও।

অলক রেগে গুম হয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে বসল, নাঃ ব্যথাটা বড্ড বেড়েছে সেই যে পড়ে গিয়েছিলাম—সারতে আর চায় না, এমন তো কখনও হয় না।

কিন্তু পায়ের ব্যথার রাগ ক্রমশঃ যামিনীর উপর গিয়ে পড়লো। ভীষণ পাজী হয়েছে যামিনীদিকে যা বলি তা শোনে না, মা না এসে পড়লে আজ··· অলক হাতের ছোট মুঠি শক্ত করে পাকায়। কিন্তু ইস্ পাটা বড্ড ব্যথা করে যে!

অলক খাটের উপর শুয়ে পড়লো রাগে আর পায়ের ব্যথায়! একটু পরেই হাসতে হাসতে যামিনীদি ঢুকলো—কম্‌নে গেলে গো দা'বাবু?

পিছন পিছন মা এসে বললেন : দেখছ অলু—তোমার জন্য কি এনেছে, কি শুয়ে পড়লে যে!

—ও দা'বাবু রাগ করলে? এই নাও আর রাগ করতে হবে না। যামিনীদি হাত থেকে ওদের নামিয়ে দিল ওদের।

কিঁউ—কিঁউ—কিঁউ—কিঁউ—

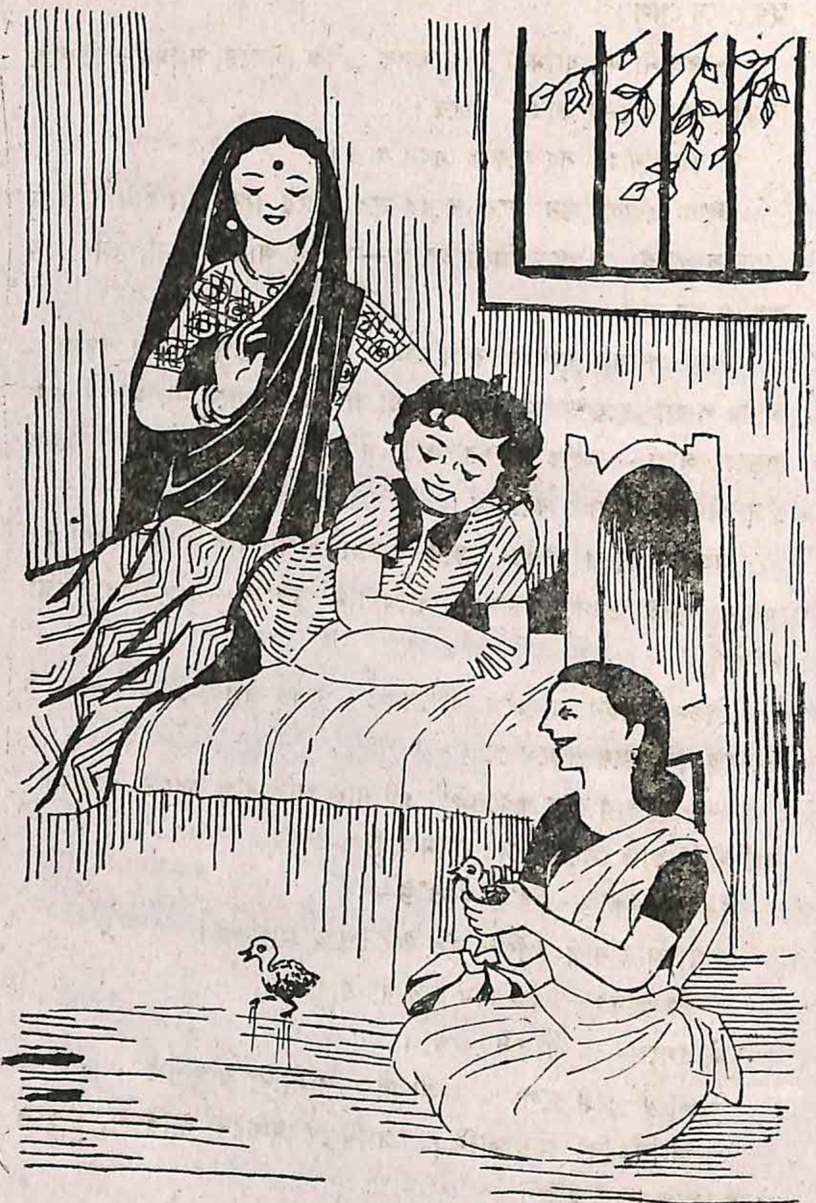
ব্যথা আর রাগ কর্পূরের মত উঠে গেছে অলকের।

—কি সুন্দর? কি নাম হবে মা এদের?

মা বললেন : যা হয় রেখো।

—না মা তুমি বলো। লক্ষী মা—সোনা মা আমার—।

—আমি কি অত জানি? আমি যে মেলাতে পারি না, তাহলে থাক্—লিলি আর ফুলি।



এই নাও আর রাগ করতে হবে না

—সে কেমন হবে ? অলক মাথা চুলকায়।

অনেক তর্ক আর নামের পর শেষে ঠিক হোল 'বাদশা আর বেগম'। কাজেই ওরা রাজপ্রাসাদ থেকে কেমন করে আসবে বলো ? আসলে তো ওরা দুটো ছোট্ট ছোট্ট সাদা হাঁসের বাচ্চা।

কিন্তু অলককে বিছানা নিতে হয়েছে। এই ব্যথা পাটা নিয়ে বড়ই মুশকিল। না ফুটবল খেলা, না ল্যাং মেরে কাউকে ফেলা, না রেলিং-এ ওঠা কি অসুবিধের ব্যাপার।

—এ রকম পা নিয়ে বাদশা বেগম-এর দেখাশোনাই বা হয় কি করে ? হাত-পাগুলোই বা এমন বেয়াড়া কেন ? একটু পড়লেই বেশী লাগবে ? কিন্তু বাদশা বেগমকে দেখে কে ?

একটু ভেবে অলক চিৎকার করে—মাসী—ও মা-সী-ই !

—এত চিৎকার করছিস কেন ? বলনা কি বলবি ?

চুরি করা আচার চাটতে চাটতে ঘরে আবির্ভাব হোল সে অলকের মাসী। অলকের চেয়ে একটু বড়ো। বড়ো বলে সে সময় ভারিক্কি চালে অলককে শাসায়। ছোট কোঁকড়া চুল, হাঁটু পর্যন্ত ফ্রক, মারামারীতে অদ্বিতীয়। শাসনের ধার ধারে না। যত দুষ্টু বুদ্ধি সংসারে আছে তার অর্দ্ধেক অলকের মাসীর মাথায় কিলবিল করছে। চিনে বাদাম খেতে ভালো লাগে বলে গলার সোনার হারটা একদিন চিনেবাদামওয়ালাকে দান করে দিল। এত উদারতা কার আছে বলো ? যখন খোঁজ পড়লো তখন চিনেবাদামওয়ালা নিশ্চয়ই বাড়ী গিয়ে হারটা তার মেয়েকে উপহার দিয়েছে। সারাদিন যত অপকর্ম আছে তার কিছু না করলে তার অসুবিধে হয়। মনে কর এই আচার চুরি করা অবশ্য সে যে অলককে দেয় না তা নয়। অলকের এক ভালোমানুষ দাদা আছে সে এ সবে যোগ দেয় না দেবার জন্য এক ঘরে হয়ে আছে।

এ হেন মাসীর যখন রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব হোল তখন অলক বললে : বুঝলি মাসী, সেই যে ফুটবল খেলতে গিয়েছিলাম—পাটা এমন মুচকে

গেছে কিছুতেই সারছে না, যতদিন ভালো করে চলতে ফিরতে না পারি তুই বাদশা বেগমের দেখাশোনা কর।

—তা করবো কিন্তু একটা ডিমও তুই খেতে পাবি না। আচারের হাতটা আর একবার চেটে নিয়ে মাসী উত্তর দিলো।

—ডিম? ডিম হবে নাকি?

—হবে না তো কি? দেখবি কালই মামলেট খাচ্ছি।

—সত্যি মাসী? সত্যি? অলকের চোখ দুটো চকচক করে উঠলো।

—তুই একটা আস্ত বোকা। হাতটা আর একবার চেটে মাসী বলে উঠলো।

—কিন্তু।

—ওসব কিন্তু টিন্তু নয়, জানিস কাল যখন···

—কই গো মাসীমা, মা ডাকতেছে যে! যামিনীর কাংস সদৃশ কণ্ঠস্বর বেজে উঠলো।

—তাহলে? অলক অসহায় হয়ে বলে উঠলো।

– সব আমি ঠিক করে দেবো তুই শুয়ে পড়গে যা।

পায়ের ব্যথায় অলক আর উঠতে পারলে না। মালিস, গরম সেঁক সবই হোল কিন্তু পাটা এমন বেয়ারা, কিছুতে দুরস্ত হোল না। যতবার উঠতে চেষ্টা করে ততবারই উঃ করে - শুয়ে পড়তে হয়। শেষ পর্যন্ত ডাক্তারবাবুকে আসতে হোল।

অলকের অসহ্য মনে হতে লাগলো—মাসীটা এখনও আসছে না কেন?

—যামিনীদি—মাসীকে একবার ডেকে দাও তো। অলক চেঁচিয়ে বলে। কিছুক্ষণ পরে মাসীর ভারী কণ্ঠ শোনা যায়, কি বলছিস বল না, আমি মামলেট খাচ্ছি।

—মামলেট? বলিস কি মাসী? অলকের চোখ কপালে উঠেছে! না পারা গেল না—মা—ওমা! দাদাজী? আর কেউ নেই না কি?

অলক অসহায়ভাবে চারিদিকে তাকায়।

—কি বলছো ? মা এলেন রান্নাঘর থেকে।

—মাসী নাকি মামলেট খাচ্ছে মা ? ও বলছিল বাদশা বেগম ডিম দিয়েছে।

—পাগল নাকি ? বাদশা বেগম সবে ডিক থেকে বেরিয়েছে, ওর কথা, ছেড়ে দাও।

—এইসা মার দেবো ওকে –ডাকো তো ওকে মা।

—খাচ্ছে, স্কুলের গাড়ি আসবে এক্ষুণি।

—ওদের খেতে দেয় মাসী ?

—তবেই হয়েছে, ও কোথায় –আর তারা কোথায় ?

—তবে যে বললে······

—ওদের এখানে আনতে বলে দাও না মা, বাথটব সুদ্ধ আনবে ওরা নাইবে আর আমি দেখবো। —আচ্ছা। অলক মার চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলো। ইস্ আমায় ঠকালো। দাঁড়াও চুলের বেণী কেটে নিয়ে যদি লুকিয়ে না রাখি তো কি বলেছি।

স্কুলের গাড়ীর হর্ণ শোনা গেল। তারপরে জুতোর দ্রুত শব্দ।

—মাসী স্কুলে যাচ্ছিস বুঝি ? —হ্যাঁ, হ্যাঁ স্কুলে যাচ্ছি।

—শোন একবার।

—আমার হয়ে তুই বেঞ্চিতে দাঁড়াবি তো—সেই বিকেলে শুনবো এখন না। তখন তোকে মামলেট খাওয়াবো।

যামিনীদি বাথটবে করে বাদশা বেগমকে ঘরে আনলো।

—জানো ছোটদা'বাবু, মাসীমা তোমার বাদশা বেগমকে নাচ শেখাচ্ছিল।

—তাই নাকি কি করে ?

—নিজে তো ঘুরতে ছিলো আর – কি সব বলতে ছিলো।

—যামিনীদি মাসী মামলেট খেয়েছে ?

—না তো সকালে বেশনের রুটির মত কি তৈরী হয়েছিল।

বড়দা'বাবু জিগ্‌গেস করতে মাসীমা বললে মামলেট খাচ্ছি।

— ওঃ আচ্ছা যামিনীদি– এরা ডিম দেবে?

— এখন কি গো, আর বড় হোক।

—আচ্ছা তুমি এদের নিয়ে যাও। মাসী এলে এখানে আসতে বলো—

অলকের ঘরের সামনে একটি বারান্দা, সেই বারান্দায় কাঠের বাক্স করে বাদশা বেগমকে কোনাকুনিভাবে রাখা হয়েছে যাতে অলক দেখতে পায়।

সেদিন রাতে অলক ঘুমুচ্ছে, বাদশা বেগমকে ডাকছে—এই শুনছিস, আর চোখ বুজে আরাম করতে হবে না।

—কেন? কেন? চোখ না খুলেই উত্তর দেয়।

—বেশ ছিলুম সোঁদা মাটির গন্ধ আর ভিজে মাটিতে ঘুরে বেড়ানো। খড়ের গাদায় শুয়ে থাকা—আর পোকামাকড় খুঁটে খাওয়া, তা না এখানে এনে বন্ধ করে রেখেছে। রাক্ষুসীর মত ঝি-টা কী পাজী!

—কেন? কেন? বেগম চোখ না খুলেই বলে।

—পাজী নয়তো কি? ঐ তো আমাদের চুপড়ির মধ্যে করে নিয়ে এলো এখানে। চারিদিক বন্ধ, এখানে কি মানুষ থাকতে পারে? আর এসব বিচ্ছিরি জিনিস খেতে ভালো লাগে না। —কেন? কেন?

—দুত্তোর—খালি কেন! কেন এই খাওয়া তোর ভালো লাগে? বাজার থেকে কুচো চিংড়ি আনে কতদিনের পচা তার ঠিক নেই—চালের খুদ, এই খাওয়া। আর এখানে যাও—তাড়া করবে, ওখানে যাও—তাড়া করবে। সেদিন ঐ রাক্ষুসী ঝি-টা বাজার থেকে মাছ এনেছে—তা দেখে আমি একটু ঠোকরাতে গেছি অমনি গলা ধরে ছুঁড়ে দিলো। কেন? কেন?

—আবার কেন কেন বলছিস? বোকা কোথাকার! বুঝিস না

ওদের মাছ খেতে গেছি যে ! আর আমি এখানে থাকছি না, পালাতে হবে—জানিস না হ্যাকার মত খালি কেন কেন করছিস। শহরে আমার পোষাবে না—চলে যাবো। ঐ যে ছেলেটা শুয়ে থাকে ওটা ভালো, আদর করে—খেতে দেয়— কিন্তু যেমন ঐ রাক্ষুসী ঝি-টা তেমনি ঐ চুল দোলানো মেয়েটা।

—যাবি যে, পথ চিনিস্ ? মরবি গাড়ী চাপা পড়ে।

—তা মরি মরবো, আর ঐ রাক্ষুসী ঝি-টার পা কামড়ে দেবো।

—কেন ? কেন ?

—কেন ও আমাদের নিয়ে এলো ? এ শহরে আসতে আছে ? বুঝলি কাল এক সময়ে পালাবো দু'জনে। —কেন ? কেন ?

—মরগে যা তুই ! আর কেন কেন কর। —আমি চলে যাবো।

—চুপ কর সকাল হয়েছে, ঐ ঝি-টা আসছে।

সারা সকাল বাদশা বেগম কিছু খায়নি। এ কথা যখন অলকের কানে পৌঁছালো তখন সে বললে, ওদের আমার কাছে নিয়ে এসো। মা বললেন, তোমার মাসী ওদের খাওয়াতে নিয়ে গেছে। আবার মাসী ! অলক মনে মনে রেগে গেছে। মা চলে গেলেন। অলক চুপ করে অনেকক্ষণ শুয়ে রইলো তারপর হঠাৎ তার কানে ঘুঙুরের শব্দ এলো। মাসী নতুন নাচ শিখেছে কিন্তু এত আস্তে মাসীর পা পড়ে ?

কিঁউ—কিঁউ—কিঁউ বাদশা বেগমের আর্তনাদ।

—মা, যামিনীদি—অলক চেঁচিয়ে ওঠে। কিন্তু কারুর সাড়া পাওয়া যায় না— শুধু রান্নাঘরে রান্নার শব্দ।

অলক সমস্ত জোর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। ব্যথার দিকে লক্ষ্য না দিলেও অসহ্য যন্ত্রণায় চোখে জল আসছে। সমস্ত শক্তি ভর করে অলক পাশের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো। দেখলো, বাদশা বেগমের পায়ে ঘুঙুর বাঁধা, গলায় ফিতে লাগিয়ে টানা হচ্ছে তাদের। শুধু শুধু টানা হচ্ছে না, অলকের মাসী নিজের ঘুঙুর পরা পা ফেলে বাদশা

বেগমকে দেখাচ্ছে।

অলক যখন মুখ তুললো—মাসী তখন বলছে : বাদশা বেগম ঝম ঝমাঝম বাজিয়ে চলেছি।

* * *

খবর পেয়েছি বেগমকে রেখে বাদশা কোথায় চলে গেছে। ব্যথা পায়ে হাঁটার দরুণ অলককে আরো দু'মাস শুয়ে থাকতে হয়েছে। বিছানায় দ্বিতীয়বার শুয়ে অলক নিষ্ফল আক্রোশে প্রতীক্ষা করেছে—এবার উঠতে পারলে মাসীর চুলের বেণী আর রাখবে না কিছুতেই!

বেচারা পুলক !

সন্ধ্যাবেলা মাঠের ফিরৎ এক-পা ধুলো মেখে আর এক-গা ঘাম নিয়ে সরাসরি ঘরে ঢুকে গিয়ে পাখার সুইচটা খুলে দিয়ে পুলক চেয়ারে বসে হাঁপাতে লাগলো। বল খেলাটা আজ বড্ড বেশী হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে দম বুঝি বন্ধ হয়ে যায়। চোখ বুজে পুলক চুপ করে রইল কিছুক্ষণ।

—কি গো বাবুসাহেব, দেখতেই যে পাচ্ছ না, আমরা ঘরে আছি। মুখ ফিরিয়ে পুলক দেখে খাটের উপর মাসী দিলুকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করছে। মাসী পুলকের চেয়ে চার-পাঁচ বছরের বড় হ'লে কি হয়, ভাব ও ঝগড়ায় দু'জনেই সমান। মেজাজ তখন অত্যন্ত খারাপ হয়ে আছে, কাজেই পুলক উদাস হয়ে বললে : তাতে আমার ভারি বয়ে গেল।

—আমি এক্ষুনি বলে দেবো, পা না-ধুয়ে ঘরে এসেছ।

—যাও, বলে দাওগে যাও।

—দিলু ঘুমুক তারপর—

দিলু পিটপিট করে চাইছে। পুলক বললে : ঘুমিয়ে একেবারে অর্ধেক রাত দিলুর, কাজেই এখন তুমি নালিশ জানাতে যেতে পারো। দিলুর দিকে চেয়ে মাসী রেগে উঠলো : ওমা, এই নাকি ঘুম ? আমি পারবো না তোমায়···

দিলু একবার মাসীর দিকে একবার পুলকের দিকে চেয়ে ফিক করে হেসে ফেললে।

—বুঝলি দিলু গল্প না বললে ঘুমুসনি—পুলক উপদেশ দিয়ে বলে উঠলো।

—পরের ঘটকালী করতে হবে না···নিজে যাও হাত-পা ধোও গে—

—তুমি দিলুকে ঘুম পাড়াও না—নিজের কাজ করো।

পুলক আস্তে আস্তে উঠে হাত-পা ধুয়ে জামা-প্যাণ্ট বদলে এসে দিলুর পাশে শুয়ে পড়লো।

দিলু তখনও ঘুমায়নি, হাতটা বাড়িয়ে পুলককে ধরে চুপিচুপি কানের কাছে কি বলতেই, মাসী বলে উঠলো : আবার !

দিলু বালিশে মুখ গুঁজলো আর পুলক বললে : গল্প ? তা এতক্ষণ বলিস্ নি কেন ? মাসী কি জানে বলবে ? – শোন, এক মস্ত সমুদ্র— ভূগোলে পড়ি শুনিস্ নি ?

দিলু চুপ করে আছে দেখে মাসী বললে : ভূগোল, সমুদ্র এসব ও কি বুঝবে শুনি ?

—ঠিক বুঝবে তারপর শোন—সমুদ্র, মস্ত নীল সমুদ্র—অথৈ জল, এপার-ওপার দেখা যায় না। গঙ্গার চেয়ে বড়, অ-নে-কগুলো গঙ্গা—

—তুই দেখেছিস সমুদ্র ? মাসী বলে উঠলো।

—থামিয়ে দেওয়া তোমার স্বভাব, সমুদ্র দেখিনি ? সেবার যে পুরী গেলাম আমরা, জলে কত চান করলুম। ঢেউতে লাফালাম, মাছের নৌকায় উঠলাম—

—মাছের নৌকা কি দাদা ? তাতে মাছ থাকে ? দিলু বলে উঠলো।

—মাছ থাকে না, তাইতে করে অনেক অ-নে-ক জলে যেতে হয়, কত বড় মাছ আনা হয়—কত সুন্দর মাছ, আরও কত কি যে আছে সমুদ্রে—

—বেশ থাকুক, দিলু চোখ বন্ধ করো তুমি—মাসী দিলুকে বললে।

চোখ বুজে দিলু বললে : মস্ত মাছ দেখেছ দাদা, জলের নীচে আরো কত জিনিষ আছে—বেশ মজা না ? ফিসফিসিয়ে দিলু বলে উঠলো।

—হ্যাঁ, সে অনেক গঙ্গা এক জায়গা করলে তারপর সমুদ্র হয়, মনে কর এমনি এক সমুদ্র আর তাতে কতই না মাছ, কত ধনরত্ন, আমি ধনরত্ন দেখিনি—কিন্তু কত মাছ যে দেখেছি—

উঁ—উঁ—উঁ শব্দ করে দিলু ঘুম-জড়ানো চোখে পাশ ফিরলো।

কিন্তু পুলক আর স্থির থাকতে পারছে না, সেখান থেকে উঠে পড়ার টেবিল, তারপর খাওয়া-শোয়া, রাতে ঘুম পর্যন্ত তার যেন পালিয়ে গেছে—কেবল মনে হ'তে লাগলো কেমন করে জলে নামা যায়। সমুদ্র নয়, গঙ্গা? তা মন্দ নয়, কিছু যদি না হয় তাহ'লে পুকুর অন্তত।

রাতে ঘুমিয়ে পুলক স্বপ্ন দেখতে লাগলো সে যেন সমুদ্রে স্নান করছে, বড় বড় ঢেউগুলোর সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে কি মজাই না করছে। দিলু পাড় থেকে বিস্মিত চোখে দেখছে আর হাততালি দিয়ে উঠছে।...পরের দিন সকালে শোনা গেল—শ্রীরামপুর যাওয়া হচ্ছে, রবিবার ছিলই, তাছাড়া সেখানে ছিল জ্যাঠামশায়ের মেয়ের বিয়ে। দিলু সকালে খুব সেজে এসে পুলককে সে খবর দিয়ে তৈরী হয়ে নিতে বললে।

শ্রীরামপুর! চমৎকার হয়েছে, গঙ্গা পাওয়া যাবে, স্নানও হবে বেশ—মনে মনে ভেবে পুলক খুশী হয়ে উঠলো।

শ্রীরামপুর পৌঁছে দেখা গেল বাড়ীতে খুব হৈ-চৈ, লোকজন, মোণ্ডামিঠাই, চেঁচামেচি। এসব কিন্তু পুলককে খুশী করতে পারলো না। কিছুক্ষণ পরেই সে বেশ একটি দল তৈরী করে নিলে। কাকামণির মেয়ে অনু, ছেলে গোপাল, বড়মার মেয়ে তারা, শংকরীদির ছেলে সুনু, তাছাড়া যারা এসেছিল তাদেরও বাচ্চাকাচ্চা চিকু, মীরু, গীতা—এছাড়া দিলু তো আছেই।

চুপিচুপি সব বেরিয়ে পড়লো। বাড়ীর দোরে গঙ্গা বললেও হয়—কিন্তু বেলা তখন প্রায় দুপুর। যাবার উপর সূর্যিমামা ঝাঁ ঝাঁ করছে, ঘাটে জনপ্রাণী নেই।

—এখন নেয়ে দরকার নেই, বেড়িয়ে ফি'রে যাই চলো—অনু বললে।

সেই ভালো, বড় রোদ—গোপাল সম্মতি দিল।

—দূর, তোরা বোকারাম—গরমে তো জলে নামতেই হয়—না পুলকদা ?—সুনু বেশ জোর দিয়ে ব'লে উঠলো।

—না বাবা, আমি নামছি নে, সেদিন বান ডেকেছিল—তারা বললে।

—তোরা হচ্ছিস ভীতুর দল, পুলকদা কোলকাতা থেকে এসেছে অত ভয় পায় না—কি পুলকদা ?—সুনু জিজ্ঞাসা করলে।

—ভয় ? ভয় আবার কি ? এই যা সাঁতার দেবো তোরা অবাক হয়ে যাবি—বীরদর্পে পুলক বললে।

—কিন্তু দাদা, সেদিন তুমি পা ভেঙ্গে পড়েছিলে, মা বলেছে এখন কিছু করবে না তুমি—ভুলে যাচ্ছ ? আর সাঁতার তুমি জান নাকি ?

পুলক দিলুর উপর খাপ্পা হয়ে উঠেছে, মেয়েটা তাকে একেবারে যা তা ধারণা করিয়ে দিচ্ছে ? ধমক দিয়ে বলে উঠলো : থাম তুই ! পা আমার, আমি বুঝবো। আর সাঁতার আমি কত দিয়েছি ইস্কুলের সঙ্গে গিয়ে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তো, নেমে পড় পুলকদা বুঝলে ?—উৎসাহ দিল সুনু।

হাফপ্যান্ট, সিল্কের সার্টে সোনার বোতাম লাগানো—তার উপরেই একটা গামছা জড়িয়ে পুলক নেমে পড়লো—কোমর অবধি জলে। সেইখানেই আছড়া-আছড়ি করে জল ছিটিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলে সে সাঁতারে কত ওস্তাদ !

কিন্তু মুনু সত্যিই সাঁতার জানে আর বোঝেও, হেসে বললে : এই তোমার ইস্কুলের সাঁতার পুলকদা ? আমি কিন্তু আরো ভাল পারি, মেয়ে ইস্কুলে শিখিনি।



ভয়? ভয় আবার কি?

লজ্জার বিষয় সত্যি! পুলকের মাথা হেঁট হয় আর কি। তাড়াতাড়ি আর একটু এগিয়ে পুলক বললে ঃ এই দেখ না।

কিন্তু এরপর পুলক আর পা রাখবার জায়গা পায় না। অকূল পাথার। উঠবার বহু চেষ্টা করতে লাগলো পুলক, কিন্তু সব বৃথা। জল জল আর জল –ক্রমশ গভীর জলে গিয়ে পড়ছে পুলক। নাকে-মুখে জল, শেষপর্যন্ত হাঁপ ধরতে লাগলো।

সুনু নতুন ধরনের সাঁতার মনে করে অবাক হয়ে দেখছে, দিলু হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো—দাদা ডুবে গেল, দাদা ডুবে গেল।

—ডুবে গেল? হ্যাঁ, তাইতো! তবে যে পুলকদা বললে, ইস্কুলের সাঁতার? সুনু আর ভাববার অবসর পেলে না। দিলু তখন তার স্বরে চেঁচাচ্ছে। ছেলেমেয়ের দল মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে, কি করবে সব?

শেষবার এক চেষ্টা করতে পুলকের হাতের আঙ্গুল ক'টি কেবল জলে ভেসে উঠলো, ব্যস্!

একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। চীৎকার শুনে যখন তিনি এসে দাঁড়ালেন তখন শেষবারের মত আঙ্গুল ক'টি দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল।

জামা-কাপড় না ছেড়েই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বহু কসরত করে পুলককে নিয়ে যখন ডাঙ্গায় উঠলেন—তখন সে অচৈতন্য, সারা দেহ নীল হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে আপনা থেকে ঝাঁকুনি খাচ্ছে।

বিয়ে বাড়ীর কাজ অর্ধ সমাপ্ত রেখে মা পুলককে নিয়ে চলে এলেন কোলকাতায়।

নতুন ধরনের সাঁতার শেষপর্যন্ত দেখানো হলো না বন্ধুদের—বেচারা পুলক!

শুধু তাই নয়—বিয়ে বাড়ীর আমোদ আর নিমন্ত্রণটাও মাঠে মারা গেল ভাবলে কি কম দুঃখ হয়—?

বেচারা পুলক !

হ্যাঁ, শ্রীরামপুরের দলের সঙ্গে পুলকের আবার দেখা হয়েছিল। ইস্কুলের সাঁতার সম্বন্ধে সুনু জিজ্ঞাসা করেছিল বৈকি !

পুলক বললে : এ-রকম কসরত তাদের সাঁতারের মাষ্টারমশাই শিখিয়েছেন।

কিন্তু আমি বলছিলাম—এ-রকম কসরত না শেখাই ভালো, নয় কি ? তোমরা ভাই সাবধান হয়ো।

কিন্তু এখনও পুলক বিছানায় শুয়ে আছে। সামনেই একটা উৎসব আসছে, কিন্তু অলক তো এখনও বিছানায়।

বেচারা পুলক !

খেয়াল

সন্তুর এ কি যে অদ্ভুত খেয়াল তা কিছুতেই বোঝা যায় না। রাজ্যের জন্তুকে নিয়ে তার লেজ ধরে ঘুরপাক খাওয়ানো। কুকুর-বেড়াল পরিত্রাহি চীৎকার করে আর সন্তুও তত জোরে হাসতে থাকে, তার ঘোরানোর মাত্রাটা বাড়িয়ে।

এ-রকম করার জন্য কম বকুনি খেয়েছে—তবুও কিছুতেই এ অভ্যাস ছাড়তে পারেনি। বড়দার কান মলা, ছোটদার চোখ রাঙানি, মাঝে মাঝে ছোড়দার দু'একটা কিল-চড়ও উপহার পেয়েছে, তবুও সন্তু এ অভ্যাস ছাড়তে পারেনি। মা বলেন: ছিঃ সন্তু! ওদের যে লাগে তা বুঝতে পারো না? তুমি যে শুধু বাড়ির পুষি আর বাঘাটাকে অমনি কর তা তো নয়, কুকুর-বেড়াল ছাড়াও—যে-জীবজন্তুর লেজ আছে তাকেই তুমি অমন করবে—এ কি কথা? মায়ের কথা দু' একদিন মনে রাখলেও সন্তু তার এই বদ্ খেয়াল ছাড়তে পারেনি।

সেদিন বাঘা আর পুষির ঘেউ ঘেউ আর ম্যাঁও ম্যাঁও চীৎকারে বাড়িশুদ্ধ সবাই বিরক্ত হয়ে উঠলো। ঘটনাস্থলে এসে দেখা গেল সেই পুরাতন দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। রাগে—বিরক্তিতে জ্ঞানশূন্য হয়ে ছোড়দা এসে সন্তুকে উত্তম-মধ্যম প্রহার দিলেন। বাঘা পুষি তখন খানিকটা দূরে গিয়ে হাঁপাচ্ছে। আর মার খাওয়া দেখে যেন তৃপ্তি অনুভব করছে।

সেদিনে রাগ আর বকুনি মার এসব নিঃশব্দে হজম করতে হলো সন্তুর। কারুরই তার উপর মায়া হলো না। হবেই বা কেন? এ ঘটনা তো আর নতুন নয়!

কিছুক্ষণ পরে যখন যে যার কাজে চলে গেল সন্তু তখন উঠলো, মার খেয়ে চোখে জল এসেছিল, মুছলো। জামা ঠিক করে একটু ভাবলো—তারপর আস্তে আস্তে বিছানায় গিয়ে বসলো। সবেমাত্র সন্ধ্যে হয়েছে, শোবার ঘরে তখন আর কেউ আসেনি; আধো অন্ধকারে বিছানায় বসে সে শাঁখের আওয়াজ শুনতে পেলো। ছোটদি সেই অন্ধকারেই ঘরে এসে একবার ধুনো দেওয়া পাত্রটা ঘুরিয়ে গেল—ঘরে কে আছে না আছে তা দেখলোই না—।

চুপ করে অনেকক্ষণ বসে রইলো সন্তু। তারপর ওর মনে হলো—পুষি এসে ঘরে ঢুকেছে; পিছন পিছন বাঘাও আসছে। দেখো দেখো কি কাণ্ড! পাশের বাড়ি হারুদের বাদামী রং-এর বেড়ালটা, কুমকুমদের বাড়ির পপি একে একে সব ঘরে ঢুকছে। আরে, ছোট মাসির ঝাঁকড়া লোমের যে এলো, নিশ্চয়ই ছোট মাসি বেড়াতে এসেছে। মিউ মিউ করে ঘরে ঢুকছে কে ওটা? ও, ওটা রাণুর সখের নতুন বেড়াল-বাচ্চা। খাটের নীচে সবাই ঢুকছে। কি ব্যাপার এদের? উঠবো নাকি! দেবো লেজ ধরে ঘুরিয়ে?

কিন্তু হঠাৎ শুনলো, খাটের নীচে থেকে বক্তৃতার মত আওয়াজ আসছে। পিসিমার বাড়ির টম বলছে, এর একটা ব্যবস্থা চাই। যখন তখন এভাবে সন্তুর অত্যাচার আমরা সহ্য করবো না। ...আমরা সকলে মিলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—সন্তুর একটা লেজ হোক।

—কি আমার লেজ হবে? আক্রোশে সন্তু লাফিয়ে উঠলো। খাট থেকে নেমে একটাকে টেনে নিয়ে আবার বোঁ-বোঁ শব্দে ঘুরিয়ে দিলো। কিন্তু এ কি! জন্তুটা কই? লেজটা হাতে রয়ে গেছে যে!

সন্তু এদিক-ওদিক খুঁজছে। হাত থেকে লেজটা কখন মাটিতে পড়ে গেছে টের পায়নি সে। এদিক-ওদিক খুঁজে সে যখন কোথাও পেলো

না তখন মাটিতে বসে পড়ে খাটের নীচে আলমারীর তলা ইত্যাদি দেখতে লাগলো। নাঃ কোথাও নেই, পেলে আর একটু শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দিত। এই তার মনের ভাব। আস্তে আস্তে উঠে সে আবার খাটে শুতে এলো। কিন্তু কি একটা ঝুলছে মনে হচ্ছে? বেল্টটা খুলে গেছে? পেছনে হাত দিয়ে সন্তু বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠলো—অ্যাঁ, এ কি! তার হাতের লেজটা কেমন করে তার গায়ে আটকে গেছে? টানাটানি করতে গেলে লাগছে—কি সর্বনাশ! সে বেরুবে কি করে রাস্তায়? কুকুর-বেড়াল বলে সবাই তাকে ক্ষেপাবে যে! সন্তু ভয়ে লজ্জায় মা, মাগো—বলে চীৎকার করে উঠলো।

মা এলেন, দেখলেন। বললেন: কি করবো বল? সব খারাপ কাজেরই শাস্তি আছে। তোমাকে সকলে কত করে বারণ করেছে কিছুতেই শোননি। একে তো ওরা অপরিষ্কার নোংরা জাত। ডাষ্টবিনে ঢুকে খায়। লোকেদের আস্তাকুড়ে যাওয়া সে-তো আছেই—তা ছাড়া একটা প্রাণী তো বটে? অমনি করে লেজ ধরে ঘোরালে কি অবস্থা হয়—তোমাকে যে কোনদিন কামড়ায় নি এই বরাত ভালো বলতে হবে।

মা তো চলে গেলেন। কারুর মনে কি সন্তুর জন্য একটু মায়া নেই? সন্তু ভাবছে। লজ্জায় দুঃখে মরে যেতে ইচ্ছা করছে তার। চোখের জলে জামাটা ভিজে উঠেছে। হায়, হায় কেন সে এতদিন কারুর কথা শোনেনি, এমনি করে জন্তু-জানোয়ারদের পিছনে লেগেছে। সত্যি তো তাদের কত কষ্ট হয়েছে। সন্তু ভাবছে আর কাঁদছে…।

জানলা দিয়ে অন্ধকারে মুখ বাড়িয়ে সন্তু দেখলো, বাবার বন্ধু মণিকাকা, গাঙ্গুলীমশাই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন—তার পিছন পিছন আসছে তার বন্ধুর দল, খেলা সেরে মাঠ থেকে ফিরছে। গল্পে-কথায় তাদের ছোট দলটি উল্লসিত হয়ে ফিরছে। আজ এ দলে সন্তু ছিল না,



কি যেন একটা ঝুলছে……

আর কোনদিনও থাকতে পারবে না। লেজ নিয়ে এদের সামনে সে বেরোবে কি করে? সবাই হাসবে, টিটকিরি দেবে—সন্তুর লেজ হয়েছে। এর চেয়ে মরে যাওয়া ভালো। স্কুলে যেতে পারবে না, কারুর সঙ্গে মিশতে পারবে না—কি করবে সে? তাদের বাড়িতে যত লোক আসবে সবাই তাকে দেখে হাসবে, ঠাট্টা করবে।

কাঁদতে কাঁদতে সন্তুর চোখদুটো ফুলে উঠলো। হঠাৎ সন্তুর মনে হলো কে যেন বলছে—যেমন কর্ম তেমনি ফল; বারণ করলে যারা শোনে না পরের কষ্ট যারা বোঝে না—তাদের এমনিই হয়—বুঝলে হে?

ঘরে আলো জ্বলে উঠলো, মা ঘরে ঢুকে বললেন: কি না? আর কোনদিন জন্তু-জানোয়ারদের কষ্ট দেবে না তো?

—না, না, না—জোর দিয়ে বলে উঠলো সন্তু।

—মনে রেখো। যাও উঠে হাত-মুখ ধোও গে। আমি খুঁজে খুঁজে হয়রান, শেষে তোমার ছোড়দি বললে, সন্ধ্যেবেলায় ধুনো দিতে এসে তোমার বিছানায় তোমায় দেখেছে।

—কিন্তু আমি উঠবো কি করে?

—কেন? কেন?

—আমার যে—

—কি হয়েছে আবার? জ্বর-টর নয় তো? দেখি।

—না জ্বর নয়, কিন্তু—ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে সন্তু। বলে, বলছি তো আর কোনদিন এমন হবে না।

মা বললেন: মনে যদি দুঃখ হয় নিজের কাজের জন্য, অন্যকে দুঃখ দেবার জন্য তাহলে সেই দুঃখই হলো শাস্তি। আর কখনোও করবে না, এ-কথা মনে রেখো, তাহলেই হবে।

সন্তু আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো—মায়ের কোল ঘেঁষে গিয়ে ভালো করে দেখলো—না কই লেজ-টেজ তো কিছুই নেই—তা'হলে?

খাটের নীচে মুখ নামিয়ে দেখলো—সেখানেও কেউ নেই। বাড়ির বাঘা পুষিটি পর্যন্ত না। তবে? স্বপ্ন দেখছিল?

সন্তু স্বপ্ন দেখছিল বা অন্য কিছু হয়েছিল, আমরা ঠিক বলতে পারবো না—তবে সন্তু আর ও-রকম কাজ করে না বা অনর্থক কাউকে কষ্ট দেয় না, তা আমরা জানি। মাঝে মাঝে পড়তে পড়তে, খেলতে খেলতে সে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়—ভাবে: ইস্, যদি সেটা স্বপ্নই হয়, তাহলে কি সাংঘাতিক দুঃস্বপ্নই না সে দেখেছে!